দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা

নিগূঢ়ানন্দ

দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা

২য় খণ্ড

[যোগ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা]

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ মার্চ — ১৯৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
ধীরেন শাসমল

ডঃ সত্যেশ পাকড়াশী

ও

ডঃ অনীতা পাকড়াশী

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঃ এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (৩য় সংস্করণ)
পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত (১ম ও ২য় খণ্ড)
সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
মৃত্যু ও পরলোক
দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা (১ম খণ্ড)
ঈশ্বর মরে গেল (২য় সংস্করণ)
সহস্রারের পথে
গীতা চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী
একান্ন পীঠের সাধক
রাজপথ তীর্থপথ (১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড)
রাজা বাদশার পথের ধারে

প্রভৃতি

দানিকেন সাহেব তাঁর 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' গ্রন্থে ভিন্ন গ্রহের কোন উন্নত জীব একদা এই মানবজাতি অধ্যুষিত পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন এমন অনুমান করে তা প্রমাণ করার জন্য অজস্র প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাঠকদের কাছে হাজির করে এক সময় বিশ্বময় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেই আলোড়ন আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। দানিকেন সাহেবের অনুমান সত্য নয় এমন কথাই বৈজ্ঞানিকেরা বোঝাবার চেষ্টা করায় 'দানিকেন-চমক' তাই আজ আর নেই বললেই চলে। তবে ভিন্ন গ্রহে যে কোন প্রাণী নেই, এমন কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন নি। থাকা সম্ভব এটাই তাঁরা মনে করেন। বিজ্ঞানের কৃৎ-কৌশল হাতেনাতে সে ধরনের কোন প্রমাণ পৃথিবীবাসী মানব সম্প্রদায়ের কাছে রাখতে পারেনি। যে সব ভিন্ন গ্রহ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে হাতেনাতে ধরা পড়েছে সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্বের প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু তার কোন কোনটায় জীবনের উপস্থিতি সম্ভব এ ধরনের অনুমান তাঁরা এখনও করে চলেছেন। সুতরাং যতক্ষণ না হাতেনাতে কোন প্রমাণ তাঁরা উত্থাপন করতে পারছেন ততক্ষণ অনুমান অনুমানই থেকে যাচ্ছে।

এক সময় উড়ন্ত চাকতির চমকপ্রদ কাহিনীও পৃথিবীময় মানুষকে রীতিমত আলোড়িত করেছিল। উড়ন্ত চাকতিতে ভিন্ন গ্রহের উন্নত জীবেরা ধরণীমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন এমনতর বিশ্বাস। কোথাও কোথাও ইউরোপ আমেরিকার বহু ব্যক্তি উড়ন্ত চাকতির মধ্যে জীবের অস্তিত্ব দেখেছেন বলেও সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপীয়দের প্রচণ্ড ভাবাবেগ অনেক সময়ই অদ্ভুতভাবে যে কল্পনা-প্রসূত হয়ে থাকে অধিমনোবিজ্ঞান অনুসন্ধান চালিয়ে এ বিষয়ে তার বহু কারচুপি ধরে ফেলেছে।

বহু প্রেতাত্মার ছবি, একটোপ্লাজমের মানবরূপ গ্রহণ, উচ্ছৃঙ্খল ভূতের (poltergeist) উপদ্রব সম্পর্কিত প্রতারণা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে। এমন কি ভারতবিখ্যাত অতীন্দ্রিয় শক্তিধারিণী ও থিওসোফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃ মাদাম ব্লাভাৎস্কির বহু অলৌকিক ক্ষমতাও যে এক ধরনের প্রতারণা ছিল তা তাঁর সমকালেই প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারত ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হন। তবু অধিমনোবিজ্ঞান একটি জিনিস বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণ করেছে যে, মানুষের অদ্ভুত একটা আত্মিক শক্তি আছে, যার দ্বারা স্থূল চক্ষুর সাহায্য ছাড়াই বহু জিনিস সে দেখতে পায়। বস্তুবাদী রাশিয়া থেকে বিজ্ঞানবাদী কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী আমেরিকা সকলেই এই অধিমনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে মানুষের মন বা আত্মশক্তির বহু প্রমাণ পেয়েছে। অনেক প্রতারণার ঘটনা ঘটে থাকলেও মানুষের অন্তস্তলে যে সূক্ষ্ম একটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে সে কথা বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ পাবার পর স্বীকার করে নিয়েছেন। এ জন্য সারা পৃথিবীতে আজ অধিমনোবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা চলেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়া।

রাশিয়াতে প্রাক্‌বিপ্লবযুগে (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে) আত্মিক বলের অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন গ্রিগরি রাসপুটিন (Grigori Rusputin)। পাগল সন্ন্যাসী নামেই তাঁর অপপ্রচার ছিল (Rasputin the mad Monk). জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোক্রোভ্‌স্কোয়ী (Pokrovskoe) নামক গ্রামে বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে। যৌবনে ছিলেন অত্যন্ত উদ্দাম স্বভাবের। কিন্তু এসময় একটি মঠ পরিদর্শন কালে তিনি আকৃষ্ট হন এবং সেখানে চারমাস প্রার্থনা ও ধ্যানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বাকী জীবন তিনি অধ্যাত্ম

পথের পথিক হয়েই ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করে সংসারী হন। কিন্তু আবার পথের ডাকে নিশাগ্রস্তের মত বেরিয়ে পড়েন। এর পরই তিনি কিছুদিন যাযাবর সন্ন্যাসী হয়ে কাটান। শেষ পর্যন্ত যখন ফিরে আসেন তখন রীতিমত এক আলাদা মানুষ। তাঁর মধ্যে তখন এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। গ্রামের তরুণেরা তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বে তাঁর অনুরাগী হয়ে ওঠে। এতে ঈর্ষাবোধ হয় স্থানীয় গীর্জার যাজকদের। সুতরাং রাসপুটিন নিজের গ্রাম ছেড়ে আবার চলে যেতে বাধ্য হন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, যাকে ভারতীয় ভাষায় বলা যায় তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি। অনেক কিছু চমকপ্রদ কথা বলে দিতে পারতেন তিনি। দ্বিতীয়বার যখন পরিব্রাজক হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর মধ্যে আর একটি ক্ষমতা আত্মপ্রকাশ করে—যা হল রোগ নিরাময় ক্ষমতা। রোগীর বিছানার পাশে বসে প্রথম প্রার্থনা করতেন, পরে তাদের দেহ স্পর্শ করে রোগ নিরাময় করতেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাসপুটিন যখন বর্তমান লেনিনগ্রাদে এসে পেঁছান ততক্ষণে সারা দেশময় তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে অভিজাত মহলেও তাঁর বেশ খাতির হয়ে যায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুশ সম্রাট বা জারের ক্ষমতার পেছনে এক অদৃশ্য শক্তি হিসেবে বিরাজমান হন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জারিনা আলেকজাণ্ড্রা বহু প্রতীক্ষিত এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন—যুবরাজ অ্যালেক্সি (Prince Alexi)। কিন্তু যুবরাজ অদ্ভুত এক রোগ নিয়ে জন্মেছিলেন, যাকে বলে হেমোফিলিয়া (Hemophilia)। এ এমন এক রোগ যা হলে রক্ত জমাট বাঁধে না। ফলে কোথাও কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হয় না। সুতরাং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তিন বছর বয়সে যুবরাজ অ্যালেক্সি

একবার পড়ে গিয়ে আহত হন। দেহের অভ্যন্তরে রক্তপাত হতে থাকে, যাকে বলে internal hemorrhage। ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেন। রাসপুটিনের সঙ্গে জারিনার দু'বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। রাসপুটিন এসেই বলেন 'যুবরাজকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।' তিনি যুবরাজের কপালে হাত রেখে, তার বিছানার পাশে বসে মৃদু কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা জানান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যুবরাজ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন। বিপদ কেটে যায়।

এর পরই জারিনা রাসপুটিনের উপর প্রচণ্ড রকমে নির্ভর করতে আরম্ভ করেন। জারও রাসপুটিনের উপর ক্রমশ আস্থা স্থাপন করতে থাকেন। দেখতে দেখতে রাসপুটিন রাজদরবারে এক প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ফলে বহু অভিজাত ব্যক্তি তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়ে যান। তাঁদের চাপে পড়ে জার শেষ পর্যন্ত রাসপুটিনকে শহর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। এই সময়ই যুবরাজ অ্যালেক্সি আর একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। জারিনা ব্যস্ত হয়ে রাসপুটিনকে টেলিগ্রাম করেন। প্রত্যুত্তরে টেলিগ্রাম করে রাসপুটিন জানিয়ে দেন যে, যতটা মনে হচ্ছে, রোগ ততটা গুরুতর নয়। তাঁর এই টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন।

রাসপুটিন যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। অথচ তখন ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে উঠছিল যে, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইউরোপের সেই উত্তপ্ত আবহাওয়াতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ সেরাজেভো নামক স্থানে গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ঠিক সেই সময় রাসপুটিনও এক পাগলাটে মহিলার দ্বারা ছুরিকা-

হত হয়ে শয্যাশায়ী থাকেন। ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এতে রাশিয়াও জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধবিরোধী রাসপুটিন সুস্থ থাকলে তিনি হয়তো জারকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দিতেন না।

যুদ্ধের গতি প্রথম থেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাসপুটিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। পাছে তিনি জারকে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দেন এই আশঙ্কায় প্রিন্স ফেলিক্স যুসুপভ্ ষড়যন্ত্র করে রাসপুটিনকে তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তাঁকে বিষমাখানো কেক খেতে দেওয়া হয়। যুসুপভ্ তাঁকে পেছন দিক থেকে গুলি করেন। তারপর লোহার রড দিয়ে তাঁকে পেটানো হয়। তার জীবনীশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাতেও রাসপুটিনের মৃত্যু হয় না। তখন তাকে একটি গর্তের মধ্য দিয়ে বরফে ফেলে দেওয়া হয়। এর পর তাঁর মৃত্যু হয়।

রাসপুটিনের কাগজপত্রের মধ্যে জারকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর আগেই যে তাঁর মৃত্যু হবে তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, যদি কোন কৃষক তাঁকে হত্যা করে তাহলে জার আরও দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারবেন। তিনি যদি কোন অভিজাত ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন তা হলে সপরিবারে জার দু'বছরের মধ্যে প্রাণ হারাবেন। রাসপুটিনের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সঠিক। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে নিহত হন।

জারতন্ত্রের শেষে রাশিয়াতে শেষ পর্যন্ত বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বলশেভিকরা ছিলেন কার্ল মার্কসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাঁরা বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন ক্ষমতায় তাঁদের বিশ্বাস নেই। অবশ্য বর্তমান বলশেভিক রাশিয়ায় অধিমনোবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষার পর মানুষের

সূক্ষ্ম একটি শক্তির উপর তাদের আস্থা জন্মেছে। এই সূক্ষ্ম শক্তি—দূর দর্শন, দূর শ্রবণ, আত্মবল প্রদর্শন সব করতে পারে। এর পেছনে বিজ্ঞানের wavelength তত্ত্ব কাজ করে বলে রাশিয়ানদের বিশ্বাস। কিন্তু রাসপুটিনকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে কি তত্ত্ব কাজ করে, তারা তা বুঝে উঠতে পারেন নি, কেননা,—ভবিষ্যদ্বাণীর সামনে এমন কিছু থাকে না যা থেকে wavelength বেরুতে পারে। শুধু এই ভবিষ্যদ্বাণীর রহস্যই রাশিয়ানরা ভেদ করতে পারেন নি, নইলে মানুষের স্থূল শক্তির বাইরে একটি সূক্ষ্ম সত্তা ও শক্তিতে তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে। স্বয়ং স্ট্যালিন নিজে ১৯৪০ খৃীঃ এমন এক সূক্ষ্ম আত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন।

১৯৪০ খৃীঃ। তখনও সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হয়নি। এই সময় রাশিয়াতে রাসপুটিনের মত আত্মবলে বলীয়ান একটি লোক ছিল বলে গুজব চলছিল। লোকটির নাম—উল্‌ফ মেসিং (Wolf Messing)। স্ট্যালিন লোকটির আত্মশক্তি পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন। নির্দেশে বলা হয় যে, সে একটি ব্যাংকে যাবে, ক্যাশিয়ারকে একটি চিরকুট দিয়ে তার কাছ থেকে এক লক্ষ রুবলস নগদ আনবে। দু'জন সরকারি অফিসার এ কাজের সাক্ষী হিসেবে থাকবে। মেসিং নির্দেশমত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের ক্যাশ রুবলস তুলে নিয়ে একটি ব্রিফ্ কেসে ভরে চলে এলেন। তারপর সেই দু'জন সরকারী সাক্ষীর সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কে ঢুকে নগদ রুবলস ও চিরকুটটি ফেরত দিলেন। কেরানীটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢলে পড়লেন। বস্তুবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে এই আত্মশক্তির প্রমাণ সত্যিই চমকপ্রদ সন্দেহ নেই।

বর্তমান আমেরিকাতেও মানুষের আন্তর শক্তির নানা পরীক্ষা-

নিরীক্ষা চলেছে। মানুষের আন্তর ও সূক্ষ্ম শক্তি যে কত প্রবল হতে পারে আমেরিকান অধিমনোবিজ্ঞানীরাও তার নানা প্রমাণ পাচ্ছেন। প্রবলতর প্রমাণগুলির মধ্যে রয়েছে একজন ডাচ, যিনি পিটার হারকোস (Peter Hurkos) নামে পরিচিত। তিনি চমকপ্রদ আত্মশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে, কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস দেখে তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারেন। কয়েকটি হত্যাকাণ্ডে আমেরিকান পুলিশ তার প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরিডা'র মিয়ামি-পুলিশ একটি হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে তার সাহায্য নেয়। এ সময় জনৈক ট্যাক্সি ড্রাইভার আততায়ীর হাতে নিহত হন। পুলিশ তাকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিয়ে হত্যাকারীর একটি বর্ণনা দিতে বলেন। হারকোস ট্যাক্সিতে বসে হত্যাকারীর চুলচেরা বিশ্লেষণ দেন। তিনি বলেন, হত্যাকারী দীর্ঘকায় এবং রোগাটে ধরনের। তার দক্ষিণ বাহুতে উল্‌কি আছে। তার নাম স্মিটি (Smitty)। সে মিয়ামিতে আর একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। একটি লোককে সে তার ঘরে গুলি করে হত্যা করেছে। একথা শুনে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এরকম অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সংস্রব আছে এরকম তারা ভাবতে পারেনি। পুলিশ তখন তাদের ফাইল খুঁজতে খুঁজতে একজন প্রাক্তন নাবিকের ছবি পায়। তার নাম চার্লস স্মিথ। নানা হোটেলে সন্ধান চলে। একটি বারের এক মহিলাকর্মী ফটো দেখে তাকে চিনতে পারে। সে বলে যে, লোকটি দুটি খুন করেছে বলে তার কাছে আস্ফালন করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্মিথকে ধরার জন্য দিকে দিকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়। নিউ অর্লিন্স-এ তাকে ধরা হয়। পুলিশ তাকে মিয়ামিতে নিয়ে আসে। সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে। ফলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কি করে এধরনের ঘটনা ঘটে পশ্চিমী

অধিমনোবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা দেননি। বর্তমান লেখক তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে (১ম খণ্ড) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহ এর যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন।

অধিমনোবিজ্ঞানের গবেষণা এটা প্রকাশ করেছে যে, মানুষ সত্যিই এক রহস্যময় জীব। বস্তুবিজ্ঞানচর্চার মত তার আন্তরসমীক্ষাও কম চমকপ্রদ নয়। সেইজন্য আন্তরচর্চার উপর বড় রকমের জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভারতবর্ষও এক সময় বস্তুবিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছিল। ন্যায় বৈশেষিকের লেখক কণাদ আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। নাগার্জুনকে তো ভারতের আইনস্টাইন বলা হয়, কেননা তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানসাধনার কথা অধ্যয়ন করলে কম চমকপ্রদ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সিন্ধু উপত্যকায় বাড়িঘর নির্মাণে যে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল তা রীতি-মত বিস্ময়কর। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবিজ্ঞান সাধনার সেই বিস্ময়কর বিবরণ পাওয়া যায় ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' পড়লে। দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যে গোপুরমের মাথায় ভারি পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়াও কম বিস্ময়কর নয়। গুপ্ত যুগে সৃষ্ট দিল্লীর লৌহস্তম্ভ তো আজও পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে আছে। এত বছরের রোদবৃষ্টি ঝড়ে তাতে এতটুকু মরচে ধরেনি॥ এই যে বস্তুবিজ্ঞানের প্রচণ্ড উৎকর্ষ, হঠাৎ কিন্তু ভারতবর্ষ তাকে বাদ দিল। বহির্বিশ্বচর্চা অপেক্ষা আন্তর বিশ্বচর্চায় সে নিজেকে নিয়োজিত করল। এর কারণ হয়তো এই যে, বস্তুবিজ্ঞান চর্চার মূল উৎস তো মানুষের মন, তার বিচারবুদ্ধি। সুতরাং যে মনের বিচারবুদ্ধি এর উদ্ভাবক নিশ্চয়ই সেই 'মন' উদ্ভাবিত জিনিস অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। ফলে সৃষ্টির দিকে নজর না দিয়ে সে তাকাল স্রষ্টার দিকে। এই স্রষ্টা বা মনের দিকে তাকাতে

গেলে বাইরে থেকে সকল মানসিক বৃত্তিকে অন্তরের দিকে পরিচালনা করা প্রয়োজন। মনকে এই অন্তরের দিকে পরিচালনা করার নামই হল যোগ। সুতরাং ভারতবর্ষ বস্তুবিজ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে আন্তরচর্চায় মনোনিবেশ করে। এই আন্তরচর্চার ফলেই ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে, বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন ইত্যাদি। এর চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে তন্ত্রচর্চার মধ্যে। তন্ত্রচর্চার মূল কথা কূটস্হান পরিক্রমা। 'কূট' অর্থ কেন্দ্র, যেখান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কেন্দ্রে ফিরে যেতে হলে কেন্দ্রের চতুর্দিকে যে জগৎ-রূপ 'সৃষ্টি' তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় জানা দরকার। তন্ত্রের নামে যে অভিচারক্রিয়া চলে আসলে তা মূল তন্ত্র নয় এক ধরনের কাপালিকবিদ্যা। এতে কিছু বস্তুগুণ আয়ত্ত হলেও, যেমন রোগ নিরাময়, বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদি, পূর্ণ সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মায় যোগক্রিয়ার ফলেই। প্রতদর্ন-যোগবিদ্যার উন্নতি সাধন করেছিলেন পতঞ্জলি। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের আরও উন্নতি ঘটায় তন্ত্রশাস্ত্র। আসলে উচ্চতন্ত্র হল এক ধরনের উচ্চমার্গের যোগ।

যোগের অর্থ একদিকে যোগ, আর একদিকে বিয়োগ। সংযোগ অর্থে যোগ হল কোন বিশেষ বস্তুতে মনকে একাত্ম করা। বিয়োগ অর্থে যোগ হল বাইরের জগৎ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করা। চূড়ান্ত যোগ হল সম্পূর্ণভাবে মনের ক্রিয়াকে নাশ করা। অর্থাৎ মনকে কোন জিনিসে যুক্ত বা বিযুক্ত করার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকা। কোন কিছু চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠ যোগ, মহাশূন্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। এই শূন্যের মধ্যেই রয়েছে পূর্ণতা। যিনি শূন্যাস্হিত হতে পারেন তিনি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন। সেই পূর্ণতা প্রাপ্তির আগে যোগের পথে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব দর্শন হয়, যাকে বলে সূক্ষ্ম দর্শন। এই সূক্ষ্ম দর্শনের মধ্যে পড়ে—কোন একটি বিশেষ স্হানে বসে এই পৃথিবীরই দূরপ্রান্ত দর্শন, যেমন,

কলকাতায় বসে, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো ইত্যাদি দর্শন এবং দূরশ্রবণ। এরও উপরে রয়েছে মহাদেশে (Space)-এ নানা সূক্ষ্ম দর্শন এবং গ্রহ গ্রহান্তরে নানা জড়পদার্থ, প্রাণ, এবং অবনত ও উন্নত জীব অবলোকন। কিভাবে এ-সব দর্শন হয়, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য কেউ যদি অধীর হতে চান, তাহলে অনুরোধ বর্তমান লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থ (১ম খণ্ড) পড়ুন। এখানে শুধু সেই সব আপাত দৃষ্টিতে রহস্যময় দর্শনের কথাই বলা হবে, আর বলা হবে, কেন এবং কিভাবে বর্তমান লেখক এই যোগদর্শনের পথে পরিচালিত হলেন, এবং কি কি রহস্যময় দৃশ্য অন্তর্জগতে প্রত্যক্ষ করলেন।

দুই

রক্তে উত্তরাধিকারের ধারা বড়, না পরিবেশের প্রভাব বড়, এ বিতর্কের অবসান আজ পর্যন্তও বোধ হয় বৈজ্ঞানিকেরা করতে পারেন নি। বর্তমান লেখক নিজে সাধারণ মানুষ, সাধারণভাবেই বেড়ে উঠেছেন, পার্থিব সুখ সম্পদের আশায় হাতড়ে বেড়িয়েছেন, যেমন আর দশজন মানুষ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগ্য যেমন বিড়ম্বনা করে, লেখকের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিপদে শুধু মার, মার আর মারই খেয়েছেন। ছোটবেলা থেকে একটিই স্বপ্ন তার মধ্যে অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সক্রিয় ছিল—লেখক হবার স্বপ্ন। সে নিয়ে প্রাণপাত করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। কিন্তু ভাগ্য যদি বিরূপ থাকে তাকে ঠেকায় কে! রোমাণ্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিক্রি হলেও নাম হল না। না হবার কারণ, উপযুক্ত প্রকাশকের অভাব। ভ্রমণ নিয়ে মনোহর কাহিনী লিখলেও ফল রইল সেই এক, অজ্ঞাতবাস। শেষ পর্যন্ত

আধুনিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে কলম ধরবার চেষ্টা করলেন। সীমিত সংখ্যক লোকের প্রশংসা পেলেও খ্যাতি পেলেন কোথায়? বোঝা-গেল—'লেখার মূল্য নয়' পত্র-পত্রিকার সাহায্যই ভারতীয় লেখকদের জীবনে বড় জিনিস, যার কল্যাণে অখাদ্যও খাদ্য হয়ে বেরিয়ে যায়, এবং ভেজাল খেয়ে অভ্যস্ত বঙ্গবাসী ভেজাল সাহিত্যই আরাম করে হজম করে। ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে শাণিত কলম ধরলেন সব কিছুকে তছনছ করে দেবার জন্য। যার ফলশ্রুতি হল 'ঈশ্বর মরে গেল' এবং 'দণ্ডিত আসামী।' রক্তের ধারা বেয়ে বংশপরম্পরায় যে অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর বিশ্বাস চলে আসছিল লেখকের মধ্যে, সেটাকেই ছুড়ে ফেলে দিতে চাইলেন তিনি। কিন্তু প্রাপ্তির ঘরে ফল রইল সেই একই সমান—অর্থাৎ 'নো এণ্ট্রান্স টু দি ওয়ার্ল্ড অব্ লিটারেচার।' এই লিটারারি ওয়ার্ল্ডের আজ্ঞাচক্র হল পত্র-পত্রিকা এবং গ্রুপিজম। সেখানে ব্যর্থ হওয়া মানে মুখ থুব্ড়ে পড়ে যাওয়া। লেখক সেই যথাপূর্বম মুখ থুব্ড়ে পড়েই রইলেন। এমন সময় নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলেন শরৎ পাব্লিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়। বললেন, একান্ন শাক্ত পীঠের উপর একটি বই লিখুন। সে বই লিখতে গিয়ে হিম্সিম্। মালমসলা প্রায় পাওয়াই যায় না। জাতীয় গ্রন্থাগার ও নিজের পকেট দুইই এক্স-প্লোর করে, অবশেষে বেরুল তার 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে।' আজন্ম বাঙালীর রক্তে রয়েছে একটা শক্তিসাধনার মানসিকতা, যদিও দৈহিক শক্তিতে অনেকের চাইতেই সে হীনবল। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালীর অধ্যাত্মতার পরিচয় একটি মাত্র কথায়—'কালিকা বঙ্গদেশে চ'। যদিও এখানে চৈতন্যদেবের মত মহা বৈষ্ণবের জন্ম হয়েছে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের মত কবির জন্ম হয়েছে, তথাপি কালীকে বাঙালীর হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি কেউই। সেই জন্য 'মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে' কিছুটা স্বাগত পেল বাঙালী পাঠকের। এবং সেই থেকে অদ্ভুত-

ভাবে লেখকের জীবনে এক পর্যায় পরিবর্তনের শুরু। এবং এর পেছনে রয়েছে আশ্চর্য কয়েকটি ঘটনা।

লেখকের এত ভাগ্য বিড়ম্বনা কেন, প্রকাশক দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সেটা জানার তখন এক বিরাট কৌতূহল। সেটা জানার জন্য অতীন্দ্রিয় শক্তিধর এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন তিনি—যাঁর সতেরোটি পয়েণ্ট ধরে ভবিষ্যদ্বাণীর সবকটিই হুবহু ফলে গেছে দুলালবাবুর জীবনে। একদিন লেখককে সেই শক্তিধর ব্যক্তিটির কাছে নিয়ে গেলেন দুলালবাবু। লেখককে দেখেই সেই শক্তিধর মহাপুরুষটি একটু হাসলেন। দুলালবাবুকে বললেন, কাকে নিয়ে এসেছেন মশাই ?

অবাক হয়ে দুলালবাবু তাকালেন তাঁর দিকে, কেন ?

—আজ যাকে নিয়ে এসেছেন, একদিন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁর দেখা পাবেন না।

শুনে দুলালবাবু যতটুকু না অবাক হলেন তার চাইতেও সহস্রগুণ বেশি হতবাক হলেন লেখক। এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরের গভীরতর কুঠরীতে জমে ওঠা অবিশ্বাসের বিস্ফোরণে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সেই শক্তিধর মহাপুরুষটি বললেন, হাসছেন কেন ?

—অবিশ্বাস্য কথা শুনে। আমি কি ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যাব যে, লাইন দিয়েও দেখা পাওয়া যাবে না ?

তিনি বললেন, প্রাইম মিনিস্টার এমন একটা কেউকেটা নন যাঁর দেখা পাওয়া যাবে না। সামান্য চেষ্টা করলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। কিন্তু···

—কিন্তু ?

—আপনার দেখা পেতে হলে চেষ্টা করলেও হবে না।

আবার হো হো করে হেসে উঠলেন লেখক।

তিনি বললেন, হাসছেন কেন ?

—আপনি যা বলছেন, তার অর্থ একটাই পাচ্ছি আমি।

—কি ?

—তাহলে আমাকে মরে যেতে হবে।

—কেন ?

—মরে না গেলে আমার মত সাধারণ মানুষের দেখা পাওয়া যাবে না সেটা কি করে সম্ভব ?

—বিদ্রূপ করছেন, করুন। কিন্তু একদিন আমার এই কথাটা মনে পড়বে, দেখবেন। যাক্ সে কথা, দিন আপনার হাতখানা দেখি।

লেখক হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তিনি হাতখানা টেনে নিয়ে কি একটুক্ষণ দেখলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, জন্মের তারিখ বলুন।

লেখক জবাব দিলেন।

—কোথায় জন্ম ?

লেখক বললেন।

একটি কাগজে কি আঁকিবুঁকি করলেন তিনি, তারপর বলতে লাগলেন। হেন অদ্ভুত বিদ্যা সত্যিই কখনও দেখেননি লেখক। হাত দেখে লেখকের ছেলে এবং স্ত্রীর হুবহু বর্ণনা দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, কাদের কি রকম মেজাজ, অসুখ বিসুখ, তাও বলে যেতে লাগলেন।

এমন ধরনের বিচিত্র মানুষ, জ্যোতিষী, মহাপুরুষ যাই বলুন, ইতিপূর্বে বর্তমান লেখক দেখেননি। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেল তাঁর উপর। মনে মনে একটা বিশ্বাস জন্মে যেতে লাগল যে, তাহলে হয়তো তাঁর কথাই সত্য হবে—একদিন দুর্লভ এক পুরুষে পরিণত হবেন তিনি। কিন্তু, তার পরই যা শুনলেন তাতে রীতিমত চুপসে গেলেন যেন। সেই জ্যোতিষী বা মহাপুরুষ, যাই বলুন, লেখককে বললেন,

—আপনি তীক্ষ্ন বুদ্ধির অধিকারী। প্রচুর পাণ্ডিত্য আছে। ভাল ভাল বই লিখেছেন। কিন্তু……

—কিন্তু……!

—নাম হবে না।

—তা হলে ?

—তাহলে ভয়ের কি আছে ?

—ঐ যে বললেন, একজন দুর্লভ পুরুষে পরিণত হবো, তা হবো কি করে ?

—কেন ? ভিন্ন ভাবে হওয়া যাবে না ?

—তা হলে তো রাজনীতি করতে হয়, চোর জোচ্চোর হতে হয়, নয়তো বিখ্যাত মস্তান হতে হয়। আজকাল তো এরাই সব চাইতে…

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, ওসব কিছু হতে হবে না।

—তা হলে ?

—আপনার পথ ভিন্ন।

—কিসের পথ ?

—যোগ এবং তন্ত্র।

এর চাইতে যদি বলতেন 'আন্তর্জাতিক স্মাগলিং' তাহলেও বোধ হয় লেখক বিশ্বাস করতে পারতেন। যোগ এবং তন্ত্রের কথা শুনে চোখ দুটি কপালে তুলে ফেললেন, বলেন কি! যোগ-তন্ত্র! আমার ফোরটিন ফোর ফাদার্সের মধ্যে কেউ বোধ হয় এ-দুটো শব্দের নামও শোনেননি।

—কিন্তু আপনার ভাগ্যে তাই লেখা আছে।

—সেটা কি করে সম্ভব ?

—কারণ, যোগ ও তন্ত্র আপনার পূর্ব জন্মের সঞ্চয়।

—পূর্ব জন্ম আছে ?

—পূর্ব জন্ম আছে, পর জন্ম আছে, সবই।

—প্রমাণ।

—প্রমাণ আপনি নিজেই একদিন পাবেন। এবিষয়ে আমি কিছু বলব না।

লেখক বললেন, তাহলে লেখা কি আমার হবে না ?

—কেন হবে না। লিখবেন। লিখেই তো দেশ-বিদেশে খ্যাতি পাবেন।

—কিন্তু ঐ যে বললেন, লিখে আমার···

—সাধারণ গল্প উপন্যাস লিখে কিছু হবে না। তন্ত্রের উপর লিখতে হবে।

—কিন্তু আমি তো তন্ত্রের উপর···

—জানেন না, এইতো ? জানতে হবে না। শুধু কলম ধরবেন। পূর্ব জন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আপনিই এসে কলমের মুখে ঝরে পড়বে।

হেন আশ্বাসে লেখকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন কিছুতেই আস্থা স্থাপন করতে পারল না। সুতরাং কোন একটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যে তিনি ফিরে আসতে পারলেন, তা নয়।

মানুষের ঊর্ধ্বে অন্য কোন সত্তা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা লেখক জানেন না। কারণ, তার নিজস্ব বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের কর্মই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিটির কাছ থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি নিজস্ব ধারায় লিখে সামান্য যা কিছু বাজার পেয়েছিলেন, ততদিনে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা অতি আধুনিক উপন্যাস কোনটিরই বাজারে তেমন চাহিদা নেই। প্রকাশকরা এক্ষেত্রে সব লেখকের উপর অর্থ বিনিয়োগ করতে নারাজ। সুতরাং দুলাল-বাবুই নতুন প্রস্তাব দিলেন। বললেন, মহাতীর্থ একাম্র পীঠের উপর হয়ে গেছে। এবার ছাব্বিশটি উপপীঠের উপর কিছু লিখুন।

ছাব্বিশটি উপপীঠ মূলত 'শিব চরিত' গ্রন্থ থেকেই এসেছে। সতীদেহের কোন অংশ বা অলংকার ইত্যাদি থেকে তাদের উৎপত্তি। মহাতীর্থ একান্ন পীঠের ভূমিকা হিসেবে মূলত কাজ করেছিল কিছু ভারতীয় দর্শনগ্রন্থ পঠন। তারই সঙ্গে একান্ন পীঠের ভৌগোলিক অবস্থানক্ষেত্রগুলি নির্ণয় করার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা থেকে 'সামান্য জ্ঞানের পুঁজি' একটি পুস্তকের আকৃতি লাভ করে। এটা যতটা অ্যাকাডেমিক ততটা অধ্যাত্ম বিষয়ক নয়, অন্তত প্রথম সংস্করণে। এর দার্শনিক অংশ কিছুটা পঠন এবং কিছুটা অনুভূতি বা intuition প্রসূত। ভৌগোলিকক্ষেত্র নির্ণয় অংশ পঠনজনিত। দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য গ্রন্থের কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল পঠনকৃত সম্প্রসারণের ফলে। তৃতীয় সংস্করণের নতুন সংযোজনা কিছুটা নতুন পঠনজনিত এবং অনেকটাই ততদিনে সাধনালব্ধ। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। যোগজগৎ বা অন্তর্জগতে প্রবেশের অনেক আগেই '২৬ উপপীঠের সন্ধানে' লেখা। সুতরাং এর মূল কাজ হল অ্যাকাডেমিক, যথার্থ অধ্যাত্মও নয়, তান্ত্রিকও নয়।

কিন্তু মহাতীর্থ একান্নপীঠের আশানুরূপ বিক্রিই লেখককে মূলত তন্ত্রের উৎস সন্ধানে এগিয়ে দিল। একটি তত্ত্বের নামাবলীই যদি এতটা এগিয়ে দিতে পারে তাহলে তার আন্তর সত্য জানা গেলে নানা জিনিসই তো হতে পারে? এরই ফলে তন্ত্র পাঠের দিকে নজর গেল। কিন্তু তন্ত্রের যথার্থ গ্রন্থ কোন্‌টা সেটিই তখন হয়ে দাঁড়াল বিরাট একটা প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় বেকুব বনা গেল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের 'তন্ত্রতত্ত্ব' পড়ে। গ্রন্থটিতে তন্ত্রের 'ত' শব্দটির পর্যন্ত ব্যাখ্যা নেই। আসলে এটি একটি গালাগালের গ্রন্থ, যাকে ইংরেজীতে বলে polemic। ভারতীয় অ্যাকাডেমিক দর্শনগ্রন্থ, যেমন, ডঃ রাধাকৃষ্ণণের 'Indian Philosophy ; The Cultural Heritage of India, ইত্যাদি

পড়েও কোন ফল পাওয়া গেল না। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy-এর প্রথম খণ্ডে বেদ বেদান্তের উপর সুন্দর আলোচনা আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে অদ্ভুতভাবে অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তন্ত্র সম্পর্কে তিনি স্পষ্টত জানিয়েই দিয়েছেন যে, এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান নেই। The Cultural Heritage of India-তে তন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও সেটা বোধগম্য হল না। 'মহানির্বাণতন্ত্র' লেখকের অনুসন্ধিৎসাকে একেবারেই তৃপ্ত করতে পারল না। তাহলে তন্ত্রের মূল সূত্রের খবর পাওয়া যাবে কোথায়?

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে যখন বেড়াচ্ছেন লেখক তখন একদিন হাতে এল প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'। কিন্তু যা খুঁজেছিলাম তা তার মধ্যে নেই। প্রশান্ত দিব্যলোকের সন্ধান দেবার চাইতে এর মধ্যে বরং আদিরসের প্রাধান্যই বেশি— ঈশ্বরের দিকে না ঠেলে মনকে বরং যৌনতার দিকেই ঠেলে দেয়। আসলে এ হল স্থূল পঞ্চ 'ম'-কারের উপর লেখা বই, যতই এর উপর তত্ত্বের ভিয়ান দেবার চেষ্টা করা হোক না কেন? ঐতিহাসিকেরা তন্ত্রতত্ত্বের বাস্তব পটভূমি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থ তার বাইরে নতুন কিছু বলেছে বলে লেখকের ধারণা হল না। সুতরাং একপ্রকার হতাশ হয়েই যখন এক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম, ঠিক সেই সময় হাতে এল উড্‌রোফ (woodroffe) সাহেবের 'The Serpent-power। বস্তুত এই গ্রন্থটিই লেখকের মনে অন্তত এই বোধটুকু জাগাতে পারল যে, তন্ত্র তথাকথিত রক্তাম্বরধারী তান্ত্রিকের তন্ত্র নয়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তন্ত্রও নয়, এ আসলে একটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ; তবে যথার্থ বস্তুবিজ্ঞান না হয়ে 'পরা বিজ্ঞান'। সে বোধ হওয়া মাত্রই নবভারত পাবলিশার্স থেকে একগাদা তন্ত্রের বই কিনে ফেললেন লেখক। কিন্তু, যে তিমির, সে তিমিরই রয়ে

গেল। ভাষা বোঝা গেল, বাচ্যার্থও বোঝা গেল, কিন্তু অন্তর্নিহিত যথার্থ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না কিছুতেই। কেন যে বোঝা গেল না সে কথা তখন লেখকের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, কারণ, লেখক তখন জানতেন না যে, এটা হল এক ধরনের Practical Art, পড়ার বিষয় নয়, করার বিষয়। সাধনা করে অন্তরের মধ্যে দিব্যজগতের স্বরূপ উপলব্ধি করা না গেলে তন্ত্রের 'ত' বা অধ্যাত্মতার 'অ' কোনটাই বোঝা যাবে না।

আসলে বোঝা গেল যে, তন্ত্রতত্ত্বের অভ্যন্তরে ঢুকতে গেলে বা অধ্যাত্মজগতের অন্তরে ঢুকতে গেলে গুরু চাই। কিন্তু সে গুরু পাওয়া যাবে কোথায়? রক্তাম্বর দেখলেই লেখকের তখন দারুণ ভয়। বস্তুত এমনতর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাবিকাঠি নিয়ে যদি তন্ত্রের দুয়ার খুলতে হয়, তাহলে তা মাথায় থাক। বই পড়ে যা বোঝা যায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাই পাঠককে দিয়ে কোন রকমে তন্ত্রের নামে বই লিখতে হবে। এবিষয়ে লোকের যখন দুর্বলতা আছে, তখন তারা কিনবেই। বাচনভঙ্গী ও রচনাশৈলী দ্বারা সাহিত্যের ভিয়ানে পাঠকের কাছে তা পরিবেশন করা গেলেই হল। লেখক যখন সেইভাবেই পরিকল্পনা ছকছেন হঠাৎ তখনই একদিন অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটে গেল। হিমালয় থেকে এক সাধক এলেন পাঠকের গৃহে। ভস্মমাখা সাধকও নয়, লাল কাপড় পরা বা কপালে সিঁদুর লেপা সাধকও নয়। রীতিমত লেখাপড়া করা আধুনিক মানুষ। এক সময় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তার পর অকস্মাৎ হিমালয়ের টানে সেখানে গিয়ে পড়ে যান এক অনন্ত শক্তিধর মহাপুরুষের আকর্ষণ বৃত্তের মধ্যে— যাঁর নাম "বাবাজী মহারাজ", শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে যিনি হিমালয়ে টেনে নিয়ে যোগদীক্ষা দিয়ে ভারতীয় সাধকদের কাছে 'যোগীরাজ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই অদ্ভুত লোকটি নাকি সেই বাবাজী মহারাজের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষিত।

বর্তমানে থাকেন মুখ্যত হল্যাণ্ডে, যোগতত্ত্ব প্রচারের জন্য। বৎসরে একবার আসেন ভারতে, হিমালয়ের দ্রোণগিরিতে। ভদ্রলোকের বয়স ৭৬-৮০। কিন্তু দেখতে মনে হয় ২৫ বৎসরের যুবক। এখন অবশ্য গৃহীর পোশাক পরেন না। পরেন এক ধরনের গেরুয়া বসন, মাথায় গেরুয়া টুপি।

ভারতীয়দের মানসিকতায় সাধুসন্তদের প্রতি একটা দুর্বলতা চিরকালই আছে। অবিশ্বাস থাকলেও বিশ্বাসের আবরণ পরিয়ে তাকে তারা মেনে নিতে চায়। ইতিহাসের কাল বিচার করলে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরু বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আধুনিক কালে জীবিত কোন মানুষের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। তবুও যোগানন্দের 'যোগীকথামৃতে' (An Autobiography of a yogi) বাবাজী মহারাজকে যখন শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরু হিসেবে একই সঙ্গে দেখানো হয় তখন তা ভারতীয় মানসিকতার জন্যই অবিশ্বাস্য হয়েও বিশ্বাসের অযোগ্য হয় না। সেই কারণেই আগন্তুক সাধুকেও অবিশ্বাস করতে মন চাইল না। লেখক শুধু জানতে চাইলেন—

—কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন ?

আগন্তুক বললেন, গুরুর নির্দেশে তাঁর যোগতত্ত্ব প্রচার করার জন্য।

—কি সে যোগ তত্ত্ব ?

—সে কথা পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে।

সে পাণ্ডুলিপি অবশ্য কখনও লেখকের পড়ে দেখা হয় নি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির সঙ্গে আগন্তুক সাধুটি যে কতকগুলি হিমালয় আঙ্গিনার ছবি নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি তাঁর দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। হিমালয়ের টান লেখকের চিরদিনই। সুতরাং সাগ্রহে তিনি সেগুলি দেখেছিলেন। কিন্তু সেগুলির মধ্যে প্রভাত

সূর্যসদৃশ একটি আলোকবৃত্ত লক্ষ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটি, কি ?

সাধকটি জবাব দিয়েছিলেন—'ধ্যানে দৃষ্ট বিন্দু'।

—ধ্যানে দৃষ্ট বিন্দু এত বড় হয় ?

—হয়।

—এ তো অন্তর্জগতের ব্যাপার। বাইরে তার ছবি তুললেন কি করে ?

সাধুটি কোন জবাব দিলেন না। হাসলেন শুধু। লেখকের মনে তক্ষুনি অবিশ্বাস জন্মালো ব্যাপারটা সম্পর্কে। কিন্তু এ নিয়ে কোন তর্ক-বিতর্ক না করে তিনি শুধু জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি ?

সাধক বললেন, 'আমার পাণ্ডুলিপিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে সাহায্য করা।'

লেখক শুধু বললেন, 'আমার যতটুকু সম্ভব, করব। তবে প্রকাশকদের ওপর কোন হাত নেই।'

যে কারণে লেখকের মনে সন্দেহ জন্মেছিল ঠিক সেই কারণেই প্রকাশকও সাধুটিকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। অর্থাৎ চোখ বুজে যে বিন্দু ধ্যান করা যায়, সে বিন্দু বাইরে ধরা পড়বে কিরূপে ? সুতরাং সাধকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হল না। সাধকটি চলে গেলেন। এর কিছুদিন পরে লেখক একটি বিদেশী জার্নালে দেখতে পেলেন যে, ভ্রূ-মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন চিন্তারত ব্যক্তিদের ফটো তুলে দেখা গেছে যে, ফটোর নিগে-টিভে সেই ক্রুশ চিহ্ন ধরা পড়েছে। সাধুটির কথা তখন তাঁর মনে পড়েছিল। তারপর এনিয়ে তেমন ভাবনা চিন্তা আর করেন নি।

ইতিমধ্যে অবশ্য ভিন্ন পথে অধ্যাত্মজগৎ নিয়ে খোঁজা-খুঁজির তাঁর শেষ ছিল না। কিন্তু যাকে বলে জট খোলা, কিছুতেই যেন

তা খুলছিল না। এইভাবে তিনি যখন হাতড়াচ্ছেন তখন আর একদিন ঘটল আর একটি ঘটনা।

কলকাতার শহরতলি অঞ্চলে কোন এক বন্ধুর দোকানে বসে গল্প করছিলেন লেখক। হঠাৎ তার বন্ধুটি বললেন, এক সাধু এসেছেন, দেখবে নাকি চল। প্রথম খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন নি লেখক। কারণ, এ সাধক হলেন এক ধরনের গুরু। এই গুরু শ্রেণীর সাধকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপদার্থ হন। শিষ্য বাড়িতে আসেন, ভালমন্দ খান, প্রণাম এবং প্রণামী দুইই নেন এবং তারপর চলে যান। দু-একটা শাস্ত্রকথা কণ্ঠস্থ আছে তাই আওড়ান, যদি এ-সবের অন্তর্নিহিত অর্থ জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে রেগে যান। শিষ্যবর্গও তাদের গুরুকে এ ধরনের প্রশ্ন করলে ক্রুদ্ধ হন। এরকম অভিজ্ঞতা লেখকের কয়েকবার হয়েছে। যেমন কোন এক গুরুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ওঁ' শব্দের অর্থ কি ?

গুরু জবাব দিয়েছিলেন অ-উ-ম।

—এর অর্থ কি ?

—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

—এর দ্বারা কি বোঝা যায় ?

—সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস।

লেখকের কাছে এধরনের জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হয় নি। কারণ, তাঁর নিজস্ব ধারণা ততদিনে এর চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস্য ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বিজ্ঞানই তাকে এই 'ওঁ' শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য করেছিল। সাধুসন্তেরা বলে থাকেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে ধরা কোনদিনই সম্ভব নয়— কারণ, অধ্যাত্মজগৎ হল পরাবিজ্ঞানের জগৎ। বিজ্ঞানের **Vacuum Fluctuation in quantum field** তত্ত্ব দ্বারা এ কথা এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শূন্যের মধ্যে শক্তি সুপ্ত থাকে। তার

স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী তা বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণ হলেই তা প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে। এই শব্দই ব্যোম বা 'ওম্' এর মত শোনায়। যেমন কোন বিস্ফোরণ হলে শব্দ হয়, ঠিক তেমনই। শব্দ সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, চার ধরনের শব্দ আছেঃ পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। এর অর্থ শব্দ যখন শূন্যে শূন্যস্থিত থাকে, তখন তা মৃতপ্রায় থাকে বা নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু থাকে না এমন নয়। অনন্তের সঙ্গে অনন্তরূপেই তা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে বলে তাকে বলে পরা শব্দ। শূন্যস্থিত শক্তি স্বভাবগুণে বিস্ফোরিত হলে প্রথম হয় আলো, তার পর শব্দ। আকাশে বজ্রপাত হলে তার দ্বারাই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বজ্রপাত হলে প্রথম চমকায় বিদ্যুৎ, তারপর আসে শব্দ। এই শব্দ আসতে বেশ সময় লাগে। সুতরাং শব্দ তার প্রথম অবস্থায় শোনার যোগ্য নয়, দেখার যোগ্য। এই জন্য এই ধরনের শব্দকে বলা হয় পশ্যন্তি শব্দ। মহাশূন্যে সুপ্ত শক্তির প্রথম যখন বিস্ফোরণ হয় তখন বিন্দুরূপে তা ফুটে ওঠে। সাধকেরা এই বিন্দুকেই ধ্যানে দেখতে পান। এই জন্য এই বিন্দুই হল পশ্যন্তি শব্দ। বিদ্যুৎ চমকাবার বেশ পরে শব্দ শোনা যায়। স্থূলকর্ণে এই শব্দ শ্রুত হবার আগে এই শব্দ বহু দূরে থাকে বলে শুনতে দেরী হয়। কেউ যদি শব্দের উৎপত্তি স্থলের দিকে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে এই শব্দ শোনার আগেই সে-শব্দ সে শুনতে পাবে। শব্দের এই যে স্থূল জগৎ থেকে দূরে সূক্ষ্ম অবস্থা, এই শব্দকেই বলা হয়েছে মধ্যমা শব্দ। শব্দ স্থূল-কর্ণে শ্রুত হলে তা 'বৈখরি শব্দ' এই নাম লাভ করে। আসলে 'ওঁ'-এর আছে এই চারটি পর্যায়। সে-কথা সেই গুরুকে বলতে তিনি ক্ষেপে লাল। বললেন, অশাস্ত্রীয়। কোন্ গ্রন্থে একথা লেখা আছে বল ?

লেখক বলেছিলেন, প্রথম যিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন তিনি কোন্ গ্রন্থ থেকে লিখেছিলেন ? যা গ্রন্থে নেই, তা যদি সত্য না হয়, তা হলে তো জ্ঞান কখনও এগুবেই না।

গুরু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তোমরা আধুনিক লেখাপড়া শিখে জাহান্নামে গিয়েছ। এইজন্য ধর্ম রসাতলে যাচ্ছে। সেই গুরুর শিষ্যমণ্ডলী লেখককে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার উপক্রম। সেই থেকে গুরুদের সম্পর্কে লেখকের বড় অনীহা।

গুরুদের সম্পর্কে এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আরও কয়েকবার লেখকের হয়েছিল। কোথায় এক পরম বৈষ্ণব এসেছেন। শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা শুরু করে দিয়েছে। লেখককে তাঁর এক বন্ধু নিয়ে গেলেন সেখানে, তিনি নাকি অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও হ্লাদিনী শক্তি রাধার দেখা পেয়েছেন। প্রেমের পূর্ণ অবতার। ভালবাসা ও অহিংসার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাঁকে লেখক বললেন, পুরাণে আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাখেলা বর্ণিত হয়েছে, সে সবে আপনি বিশ্বাস করেন ?

—করি।

—তাহলে তাকে তো দুঃশ্চরিত্র বলতে হয়।

—তোমাদের মত অবিশ্বাসীরাই তা ভাবতে পারে।

—আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ যাক। তিলক পরলে কি পুণ্য হয় ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে তো যে-শুয়োর গায়ে কাদা মেখে থাকে তারও পুণ্য হয়।

একজন শিষ্য রেগে-মেগে বললেন, এধরনের কথা বলবেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গা স্নানকে কি পুণ্য বলে মনে করেন ? স্বর্গে যাবার একটি উপায় বলে ভাবেন ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে গঙ্গায় যত কচ্ছপ; মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি থাকে, সবারই স্বর্গলাভ হবে ?

গুরু রেগে গিয়ে বললেন, এই সব বাজে তর্ক করার জন্যই কি এখানে এসেছ ?

লেখক বললেন, না, জানতে এসেছি।

গুরু বললেন, আসলে আধুনিক বিদ্যা লাভ করে তোমরা বিপথে গিয়েছ। সেই জন্য দেশের এই অবস্থা।

লেখক বললেন, আপনি রেগে যাচ্ছেন। অথচ বৈষ্ণবদের মূল কথা হল ক্রোধহীনতা। এদিক থেকে দেখতে গেলে আপনাকে কি বৈষ্ণব বলা যায় ?

তাঁর শিষ্যেরা এতে এত রেগে গেলেন যে, লেখককে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার অবস্থা। গুরু সম্পর্কে লেখকের এ আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা।

আরও এক জায়গায় গুরু সন্দর্শনে গিয়ে লেখকের আরেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। গুরুকে লেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ওঁ' শব্দ ঠিক এমনটি করে লেখা হয় কেন ?

গুরু বললেন, এমন করেই লেখা হয়।

—এমন করে লেখা হয় কেন ?

—এ উদ্ভট প্রশ্নের কোন জবাব থাকতে পারে ?

লেখক বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই জবাব আছে।

—তুমি কোন জবাব দিতে পার ?

—হয় তো বা পারি।

—পার ?

—হ্যাঁ।

—বল।

লেখক তাকে যে ভাবে 'ওঁ' শব্দ লেখার অর্থ বুঝিয়েছিলেন তা এই ধরনের ঃ

(শূন্য) = পরা শব্দ

• = পশ্যন্তি শব্দ।

◡ = গোলক তৈরি হবার প্রারম্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পর্যায়, অর্থাৎ মধ্যমা শব্দ। সেই কারণে অর্ধবৃত্ত।

ও = তন্ত্রে 'ও' শব্দের বর্ণ রক্তাভ (রক্ত বিদ্যুল্লতাকারং) এই রক্তবর্ণ হল স্থূলতার প্রতীক পৃথিবীর রঙ। তবে বর্তমানে Space থেকে নাকি পৃথিবীর রঙ নীলাভ দেখায়, সেই জন্য অনেকে একে Blue planet নাম দিয়েছেন। তবে অ্যাপোলো সেকেণ্ড-এ ৯৮০০০ হাজার মাইল দূর থেকে যে ছবি নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, ভূস্তরের রঙ লাল। এই লাল রঙের ওয়েভলেংথ অন্যান্য রঙ অপেক্ষা দীর্ঘতর। এখানে এসেই শব্দতরঙ্গ স্থূলতা প্রাপ্ত হয়।

গুরু বললেন, কোন্ গ্রন্থে এ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে?

—কোন গ্রন্থেই নেই। এ হল আমার ব্যাখ্যা।

গুরু জবাব দিলেন, এ হল এক ধরনের বাঁদ্রামি। যাও, ঘরে গিয়ে ধর্মশাস্ত্র পড়। অধ্যাত্মজগৎ তোমার নয়। চাকরী কর, বাকরী কর। ঐ নিয়েই থাক।

গুরুবাক্য বেদবাক্য। এর উপর আর কিছু থাকতে পারে না। সুতরাং সেখান থেকেও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা লেখক একপ্রকার বিতাড়িতই হয়েছিলেন।

গুরু সম্পর্কে লেখকের শেষ মোহ ভাঙে আরেক গুরুর কাছে গিয়ে। লেখক তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

—প্রণব শব্দের অর্থ কি?

—'ওঁ'

—'ওঁ' কে প্রণব বলা হয় কেন?

—শাস্ত্রে এরকমই বলা আছে।

—কেন?

—এ-'কেন'র কোন জবাব নেই।

—আমি যদি বলি আছে ?

—বল শুনি।

লেখক তখন প্রণবের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ঃ

প্র = পূর্বে। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। (সৎ)

ণ = তন্ত্র মতে কুণ্ডলিনী বা শক্তি। (চিৎ)। সৎ-এর সঙ্গে একাত্ম সতী

ব = হল শক্তির বিস্ফোরণজনিত প্রথম আলো, দিব্যস্নিগ্ধতা-পূর্ণ। তন্ত্রমতে শরচ্চন্দ্রসন্নিভ দীপ্তিমান। (আনন্দ।)

অর্থাৎ প্রণব হল পশ্যন্তি পর্যায় পর্যন্ত আদি ধ্বনি। অর্থাৎ বিন্দু।

গুরু বললেন ঃ এব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

—কেন ?

—কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া নেই।

লেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শব্দ ব্রহ্মণ বলতে কি বোঝেন ?

—শব্দই সব।

—শব্দই সব, একথা বলতে কি বোঝেন ?

—এতো অতি সহজ কথা। শব্দই সব, এ আবার বোঝাবার কি আছে। একটা অশিক্ষিত লোকও একথা বুঝতে পারে। তুমি পার না ?

—একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করলে কি করে বোঝা যাবে ?

একটু ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুরু বলেছিলেন, তোমার কোন ব্যাখ্যা আছে ?

—আছে।

—বল শুনি।

লেখক বলেছিলেন, শব্দ হল চার রকম—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। এই শব্দ আর কিছুই নয়, এক ধরনের স্পন্দন বা

Vibration. আদিতে Vibration ছিল সুপ্ত (Latent)। বিস্ফোরণে বিন্দুরূপে জ্যোতি হিসেবে দৃষ্ট। সেই বিন্দু থেকে নানা তরঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে শেষপর্যন্ত স্থূলরূপে প্রকাশিত। ইদানীং বিজ্ঞানেও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন কিছুই মৃত নয়। জড় বস্তুর মধ্যেও এক ধরনের স্পন্দন আছে, অর্থাৎ শব্দ। সুতরাং আদিতে নির্গুণ অবস্থায়ও শব্দ ছিল। জ্যোতি অবস্থাতে, সূক্ষ্ম অবস্থাতে এবং স্থূল অবস্থাতেও তা আছে। ব্রহ্মাণ হলেন সর্বব্যাপ্ত। এই সর্বব্যাপ্তিতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে শব্দ বা Vibration নেই। সুতরাং শব্দকে ব্রহ্মাণ বলা ছাড়া উপায় কি?

গুরু ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি নতুন একটি শাস্ত্র রচনা কর।

লেখক বলেছিলেন, আপনারা যদি সহজ সরলভাবে শাস্ত্রবাক্য লোককে বোঝাতে না পারেন তাহলে আমাদেরই শাস্ত্র লিখতে হবে, তা ছাড়া উপায় কি? সে-কথা থাক। 'নাম ও রূপ' বলতে আপনারা কি বোঝেন? গুরু পুনরায় ব্যাঙ্গ করে বললেন, তুমি তো দেখছি সর্বজ্ঞ, তুমিই বল।

লেখক তখন 'নাম ও রূপের' নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেনঃ নাম মানে শব্দ অর্থাৎ Vibration. Vibration বা স্পন্দন মানেই বর্ণ। এই এক একটি বর্ণকেই প্রতীকী রূপ দিয়ে অক্ষর রূপে ধরা হয়েছে। যে জন্য আমাদের দেশে অক্ষরকে বর্ণও বলা হয়, যে কারণে 'অক্ষর পরিচয়' লেখার সময় বিদ্যাসাগর তার পুস্তিকার নাম দিয়েছিলেন 'বর্ণ পরিচয়'। সুতরাং শব্দ বা নাম হলেই তার একটা রূপ হবেই। যে রকম শব্দ যে রকম রূপ। নামের সঙ্গে রূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই জন্যই বলা হয়েছে 'নাম ও রূপ'।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে, কৃষ্ণনামের মধ্যেই কৃষ্ণরূপ রয়েছে?

—নিশ্চয়ই।

—কৃষ্ণনামের যথার্থ Vibration-কে যদি মন্ত্রে ধরতে পারতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, কৃষ্ণরূপ যে মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে সেই মূর্তিই ধরা পড়েছে।

—তোমার নামের মধ্যেই তাহলে তোমার রূপ রয়েছে?

—নিশ্চয়ই।

—একই নামের তো দু'জন লোক হয়, তাহলে দু'জনের রূপ এক হয় না কেন?

—জাতকের নাম রাখার জন্য যে কতকগুলি নিয়ম আছে তা মানা হয় না বলেই। আমাদের দেশে নামকরণের একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্যই তা হয় না। অর্থাৎ একটি রূপের মধ্যে যে Vibration আছে তা উপলব্ধি করেই নাম রাখতে হয়। আজকাল তা কেউ করে না। তা ছাড়া একই নাম এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রূপে উচ্চারিত হয়। এছাড়া রূপের সঙ্গে চরিত্রও একাত্মভাবে যুক্ত থাকে। আকৃতি ও চরিত্র নিয়েই রূপ। সে দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখবেন কোন নামই ভ্রান্ত নয়। অন্ধকার ও Darkness দুটি শব্দ। বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় একই ধরনের Vibration পাওয়া যাবে। বস্তুত একটি নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি রূপ ফুটে উঠবে জানবেন। যেমন, আম বলতে একটি আকৃতি, এবং মানুষ বলতে আর একটি আকৃতি।

—তুমি সব অদ্ভুত তত্ত্বকথা শোনাচ্ছ দেখছি!

—শোনাচ্ছি না। তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা থেকেই এরকম ভাবছি। যেমন, আপনাদের তারক ব্রহ্ম নাম নিয়েও আমার অনেক ভাবনা চিন্তা এসেছে।

—তাই নাকি? বল, শুনি?

—লেখক তখন নিম্নোক্তভাবে তাঁর তারক ব্রহ্ম নামের স্বরূপ

ব্যাখ্যা করছিলেন ; শাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করতে গেলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম অর্থ দাঁড়ায় এই রকম ঃ হরে অর্থাৎ হরণ করেন। কৃষ্ণ অর্থ যিনি আকর্ষণ করেন। রাম অর্থ রমণ ক্রিয়া। তাহলে তারক ব্রহ্ম নামের অর্থ দাঁড়ায়—হরে কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি জগৎ সৃষ্টি করে তাতে আকর্ষণ করেন তিনিই সেই আকর্ষণ হরণ করেন। কিংবা যিনি মূলে আকর্ষণ করেন তিনি আমাদের বন্ধন হরণ করুন। এই যে শ্রীকৃষ্ণ তার বাস কোথায়? বৃন্দাবনের কেন্দ্রে। এই বৃন্দাবনকে শ্রীশ্রী রামঠাকুর বলেছেন পঞ্চক্রোশ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে সৃষ্ট স্থূল জগতের অণু পরমাণু থেকে জীব, সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে একটি গোলক—অর্থাৎ এই চিহ্ন—০—যাকে বলা যায় শূন্য (Void)। এই শূন্যে কোন ধরনের ক্রিয়া নেই অর্থাৎ কোন ধরনের কুণ্ঠা নেই। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। বিষ্ণুর বাসস্থান এই বৈকুণ্ঠে। সুতরাং যেখানে কোন কুণ্ঠা নেই সেখানে কৃষ্ণ আমাদের আকর্ষণ করুন।

রাম, অর্থাৎ যিনি রমণ ক্রিয়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। 'হরে রাম' অর্থ, সেই রাম আমাদের জগৎ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন।

তাহলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ অর্থ দাঁড়ায়—জগৎ স্রষ্টা মায়া থেকে আমাদের বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করুন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে অর্থ, আমাদের জগতের আকর্ষণ হরণ করুন, অর্থাৎ জগৎ বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দিন।

হরে রাম হরে রাম অর্থ যে পরমপুরুষ শক্তির সঙ্গে রমণ ক্রিয়া মগ্ন, জগতের প্রাপ্ত ভাগ থেকে তিনি সেই রমণ ক্রিয়ার উৎসের দিকে দিকে আমাদের হরণ করুন অর্থাৎ নিত্য ঈশ্বরের স্বাদ বুঝতে দিন। রাম রাম হরে হরে অর্থ রমণক্রিয়াজাত জগৎ-বন্ধন হরণ করুন।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা তো এ ধরনের কোন ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে চাইবেন না—সুতরাং তাঁরা এর একটি বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, যে সুরে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে এবং হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে গাওয়া হয় মানুষের ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে তার একটা মিল আছে। মানুষের ধমনীতে প্রবাহিত এই প্রাণছন্দ আসলে বিশ্বেরই নৃত্য ছন্দ। বিশ্বের এই নৃত্যছন্দই হল শাস্ত্র মতে ঋত্ ('রি' বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া ধাতু থেকে)। সেই ঋতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই জীবনে একটা সাম্যভাব আসে। এই সাম্যভাব হলেই সুখ দুঃখে সমভাব আসে। এই সুখ দুঃখে সমভাবই হল নিরাকর্ষণ ভাব অর্থাৎ যথার্থ মোক্ষ। যে নাম বা ছন্দ এই ভাবে ত্রাণ করে, তাই তারক। সেই জন্যই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে' হল তারকব্রহ্ম নাম। এখানে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এই কারণে যে, শব্দই হল ব্রহ্মাণ ('রি'=বৃদ্ধি পাওয়া ধাতু থেকে)। সুতরাং যে শব্দ ব্রহ্মাণ তারণ করে তাই 'তারকব্রহ্ম' নাম। কেউ যদি এর গুরুত্ব না জেনেও এ নাম করে যায়—তাহলে প্রাণছন্দ বা বিশ্বছন্দ বা ঋতের সঙ্গে সে একাত্ম হয়। ফলে সে মুক্তি লাভ করে। এ হল এক ধরনের নামযোগ। কলি কালে নানাভাবে বিভ্রান্ত মানুষের পক্ষে সচেতনভাবে মন-স্হির করে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই এই 'তারকব্রহ্ম' নাম করে বিশ্ব ঋতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বাভাবিকভাবেই মোক্ষলাভ করতে বলা হয়েছে।

গুরুদেবটি কি বুঝলেন জানি না। শুধু মুখের ভাব একটু বিকৃত করলেন। অর্থাৎ এমনতর যাবনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে তিনি রাজি নন। লেখকের প্রতি গুরুদেবের এই মনোভাব লক্ষ্য করে শিষ্যেরা বললেন, এবার গুরুদেবের অন্য কাজ রয়েছে—

অর্থাৎ লেখককে তাঁরা নোটিশ জারি করে দিয়ে বললেন যে, এবার আপনি আসতে পারেন।

সেই থেকে লেখকের গুরুদেবদের সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তাঁর ধারণা, তাঁরা আপ্ত বাক্যকে ব্যাখ্যা করে বুঝতে চান না। তাদের কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লেখকের বন্ধুটি যখন বললেন, 'একজন সাধু এসেছেন, চল দেখবে নাকি' তখন লেখক খুব একটা সায় দিতে পারেন নি। ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু নিয়তির রহস্যের শেষ নেই। শেষপর্যন্ত বন্ধুর পেড়াপীড়িতে তাঁকে যেতেই হল।

সাধুটিও একজন গুরু। বহু শিষ্যসামন্ত আছেন। শহরতলি অঞ্চলে তিনি তাঁর এক শিষ্যের বাড়িতেই এসেছেন। তাঁর বড়লোক শিষ্যেরা তাঁকে একটি গাড়িও করে দিয়েছেন। সেই গাড়ি করেই তিনি এসেছেন। কিছু একটা পাওয়া যাবে এরকম বিশ্বাস না নিয়েই লেখক ইতস্তত করতে করতে সেই শিষ্যটির বাড়ি ঢুকলেন। দোতলার একটি ঘরে গুরুদেব বসে আছেন। শিষ্যরা মেঝেতে মাদুরের উপর বসে ভিড় জমিয়েছেন। গুরুদেব একটি খাটের উপর বসে ছিলেন। লেখক এবং তার বন্ধু দরজায় উঁকি দিতেই তিনি ডাকলেন ··'এস, এস'। এমন আমন্ত্রণ! যেন কতদিনের চেনা।

লেখক তাকিয়ে দেখলেন গুরুদেবকে। প্রায় সাত ফুট লম্বা হবেন। দীর্ঘ কেশ। কিছুটা পাক ধরেছে তাতে। কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁপ। যেমন দীর্ঘ বপু, তেমনই বিস্তৃত বক্ষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। দেহে একটা অপূর্ব দীপ্তি যেন ঝল্‌মল্‌ করছে। লেখক ঘরে ঢুকেও কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। পুনরায় হাস্যমুখে আমন্ত্রণ জানালেন সাধুটি—'এস বাবা, বোস।'

মাদুরের উপর শিষ্যদের পাশে গিয়ে লেখক বসলেন। সাধুটি বললেন, বল বাবা, কিছু তত্ত্বকথা বল। তুমি তো পণ্ডিত লোক। বইটই লিখেছ।

আশ্চর্য। সাধুটি লেখকের এ পরিচয় কি করে পেলেন ভেবে তাঁর অবাক হবার অন্ত থাকল না।

লেখক বললেন ঃ তত্ত্বকথা আপন মনে কি বলব। আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করুন, আমি বলি। গুরুদেবটি জিজ্ঞেস করলেন, বিন্দু বলতে কি বোঝ ?

লেখক বললেন, শাস্ত্র মতে, যার অস্তিত্ব আছে পরিমাপ নেই।

—শাস্ত্রের বাইরেও এ বিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—বল শুনি।

লেখক বললেন, শূন্যস্থিত শক্তি স্বভাবগুণে ফুটে উঠে যে আলো সৃষ্টি করে তাই বিন্দু। এই বিন্দুই পরে তরঙ্গে তরঙ্গে সম্প্রসারিত হয়ে ঘূর্ণনের বেগে ডিম্বাকৃতি জগৎ তৈরি করে। (তবে সব ডিমই হাঁসের ডিমের মত নয়। গোল ডিমও আছে) এই জন্যই জগতের নাম ব্রহ্মাণ্ড। বিন্দুই হল শব্দ তত্ত্বের পশ্যন্তি শব্দ।

লেখক দেখলেন, অন্যান্য গুরুদের মত এই গুরুটির কোন আপ্ত বাক্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নেই। ব্যাখ্যা দিলে, কারণ দিলে বোঝেন।

তিনি বললেন, বাঃ, চমৎকার ব্যাখ্যা তো ! ভেবে দেখবার মত। আচ্ছা বাবা, ভগবান বলতে তুমি কি বোঝ ?

—ভগবান বলতে হাতপাওয়ালা কোন জীব আমি বুঝিনে। ভগের যিনি অধীশ্বর তিনিই ভগবান।

—'ভগ' বলতে তুমি কি বোঝ ?

লেখক দৃষ্ট ভিন্ন গ্রহে রক্ত মাংসের মনুষ্যাকৃতি প্রাণী। লেখকের মতে মহাশক্তি (কালী) স্বয়ং।

বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখিত বড়িষা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের (বড়বাড়ি) সেই অলৌকিক রথ যার সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে ।
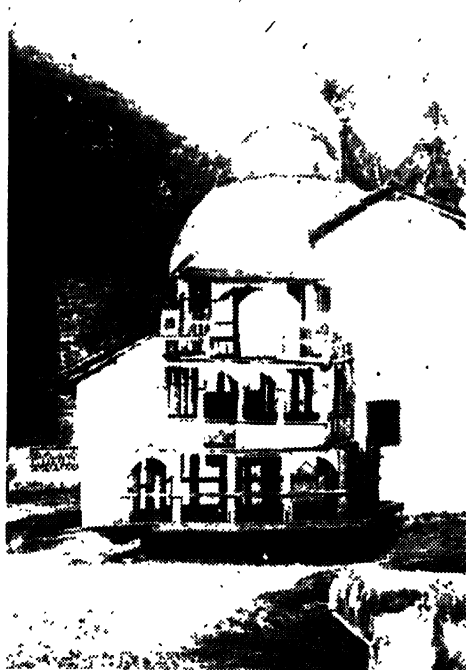
বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখিত বরিষা (বড় বাড়ির) সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের
পুরানো রথ

মানবেন্দ্র রায়
১৮০ বিধানপল্লী
পোঃ গড়িয়া কলিকাতা-৮৪
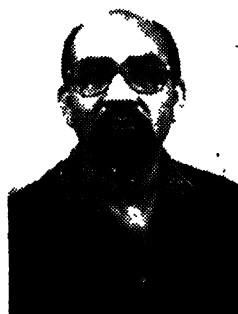
অজয় ঘোষ চৌধুরী
সুভাষগ্রাম, পোঃ কোদালি:
২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

১। দাঁড়িয়ে বাঁ দিক থেকে ভূধরচন্দ্র মণ্ডল ও সত্যানন্দ মুখার্জি (গ্রাম এ. পি নগর, সোনারপুর ও বাঘাযতীন হাইস্কুল ঃ যাদবপুর)

২। বসে বাঁদিক থেকে শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও কল্যাণকুমার নাথ (৮ নং বিষ্ণু পল্লী পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী ; আর জি. পল্লী পোঃ সোনারপুর ২৪ পরগণা)

সবিতা সরকার
১৭১/২ সি, রাসবিহারী এভিনিউ

মধুসূদন বসাক
এম্ বি. রোড বিরাটি

—ভগ অর্থ যোনি। আসলে এনার্জি বা শক্তি। এই শক্তি যার মধ্যে থাকে তিনি ভগের অধীশ্বর অর্থাৎ ভগবান।

—এই যে শক্তি বা ভগ তা কার মধ্যে থাকেন।

—শূন্যে।

—একথা তুমি জানলে কি করে?

—বিজ্ঞান পড়ে।

—বিজ্ঞানের এবিষয়ে ধারণা কি?

—বিজ্ঞান এবিষয়ে একটি তত্ত্ব দিয়েছে যার নাম **Vacuum fluctuation in quantum field**।

—এর দ্বারা কি বোঝায়?

—শূন্যে শক্তি সুপ্ত থাকে। স্বভাবগুণে তা নড়ে উঠে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জগৎ তৈরি করে। এই যে জগৎ তা শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং শূন্যের মধ্যে শক্তি থাকে বলে শূন্যই ভগবান অর্থাৎ শক্তির অধীশ্বর।

—তা হলে ভগবান আর শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্মণ একই জিনিস?

—হ্যাঁ।

—এই যে ব্রহ্মণ তাকে নির্গুণ বলা হয়। এর মধ্যে শক্তি থাকলে তা নির্গুণ হয় কি করে?

—শক্তি যখন শূন্যে নিষ্ক্রিয় থাকে তখনই তা সম্পূর্ণ নির্গুণ। আবার শূন্যস্থিত শক্তি যখন সক্রিয় হয় তখনও শূন্য শূন্যই থাকে। শক্তি শূন্য থেকে উদ্ভূত হলেও শূন্যের কোন হেরফের হয় না। শূন্যের বুকেই শক্তি খেলা করে, আবার শূন্যেই লীন হয়। শূন্য শূন্যই থাকে। শক্তির খেলার সময়েও সে নির্গুণ থাকে। আবার শক্তির অর্থাৎ জগতের লীলা শেষ হলেও সে নির্গুণই থাকে। তার কোন হেরফের হয় না।

গুরুদেবটি বললেন, আচ্ছা শূন্য ও পূর্ণের মধ্যে তুমি কোন পার্থক্য দেখ?

—না।

—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি গ্রন্থ 'ধর্ম' তাতে দুঃখ নামক নিবন্ধে পড়েছিলাম—তিনি বলেছেন 'পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা'।

—রবীন্দ্রনাথ এখানে ভুল করেছেন।

—পূর্ণতার বিপরীত যে শূন্যতা নয়, তা তুমি কি করে বোঝাবে ?

লেখক বললেন, 'আপনি তো সাধক। সমাধিস্থও হয়েছেন। সমাধিস্থ হবার পরই কি ত্রিকালজ্ঞ হননি ?

গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। লেখকের কাছে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, বাবা, আমি ত্রিকালজ্ঞ নই। তবে তোমার এই ধারণার তারিফ করছি।

আশ্চর্য! ঐ বিশালবপু বক্ষে অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা অনুভব করতে পারলেন লেখক। গুরুদেব আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা তোমাকে একটি কথা বলব ?

—বলুন।

—তুমি বিন্দু ধ্যান কর বাবা!

লেখকের মনে যে অধ্যাত্ম সাধনার কোন ইচ্ছা ছিল না তা নয়। তবু বোধহয় সাধক গুরুকে পরীক্ষা করার জন্যই বললেন, বিন্দু ধ্যান ? অসম্ভব।

—কেন ?

—ক্ষুদ্রতম একটা বিন্দুর উপর মন কিছুতেই বসতে চাইবে না।

—কিসে তবে বসতে চাইবে ?

——কোন সুন্দরী মহিলার মুখ হলে বরং বসতে চাইবে।

সাধকগুরুর মুখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, তাই কর বাবা।

লেখক বললেন, তাও যদি অনেকক্ষণ ধরে করতে হয় তবে পারব না।

—কেন?

—কারণ, কোন কিছুতেই আমার মন অনেকক্ষণ বসে না।

সাধক উঠে দাঁড়ালেন এবং লেখককে কাছে ডাকলেন। তারপর তার সমুদ্র সদৃশ বিশাল বুকের মধ্যে শালপ্রাংশু দুই ভুজের দ্বারা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মাথার উপর হাত রেখে কি জপ করলেন তিনিই জানেন। জপ শেষে বললেন, যাও।

কিন্তু এত সত্ত্বেও যে লেখকের অধ্যাত্ম সাধনার জন্য কোন আগ্রহ দেখা গেল তা নয়। বরং নানা গ্রন্থ খুঁজে ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার অর্থ খুঁজতে লাগলেন তিনি। তখনও তাঁর এ বোধ জন্মেনি যে, অধ্যাত্মজগৎ পুঁথি পুস্তক পাঠ করে প্রবেশ করার জগৎ নয়। অধ্যাত্মজগৎ নিজে সাধনা করে প্রবেশ করার জগৎ। অধ্যাত্মতা হল এক ধরনের Practical Art। নিজে চর্চা না করলে এ জগতের মর্মোদ্ঘাটন হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

জগৎ সৃষ্টির মূলে, স্থিতিতে এবং লয়ে সর্বত্রই বোধহয় একটি তত্ত্বই সর্বাপেক্ষা প্রবল, তা হল 'অহং তত্ত্ব'। আদিতে সৎ (void)-এর অঙ্গীভূত শক্তির স্বাভাবিক স্পন্দনে যখন তার মধ্যে চিৎ-এর উদ্ভব হয় অর্থাৎ 'আমি' এই বোধের উদ্ভব হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে 'তুমি' এসে যায়, অর্থাৎ Subject-এর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই object এসে যায়, কারণ, object ছাড়া Subject থাকতে পারে না, আবার Subject ছাড়া object হতে পারে না। এই object-এর সৃষ্টি হতেই Subject-এর মধ্যে একটা আনন্দ বোধ জন্মে। এই আনন্দই বিন্দু আকারে মহাশূন্যের বুকে বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাশ পায়। এর কিছু অংশে শুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য এত প্রবল থাকে যে, তা তন্ত্রশাস্ত্রে 'বিদ্যা' পর্যায় নামে অভিহিত। এর পরই স্বচ্ছ চৈতন্য ক্রমশ স্পন্দনের তীব্রতায় সূক্ষ্মতম অবস্থা

থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থার দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ তার স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে এবং নিষ্কলঙ্ক অনন্তবোধ-রূপী চৈতন্য ক্রমশ সীমিত চৈতন্যে রূপান্তরিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চৈতন্য যখন ঘনীভূত হয় তখন এই চিৎবোধ অর্থাৎ অহং-বোধ অণুপরমাণুর বন্ধনে এমন ছড়িয়ে পড়ে যে, সে তার অনন্ত অসীমত্ব হারিয়ে ফেলে ক্ষুদ্র অহংতত্ত্বে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু সেই অবস্থাতে সে বেশিদিন থাকতে পারে না। বৃক্ষের পত্রপল্লবে যেমন একদিন প্রাণের আবেগে অদৃশ্য একটি পুষ্পের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তার পর ফুল ফোটে, ফল হয়, ফল বড় হয়ে পাক ধরে, পেকে গিয়ে ঝরে পড়ে এবং তারপর স্বাভাবিকভাবে ফলে ত্বক, ত্বক অভ্যন্তরস্থ বীজের খাদ্য, তার পর বীজবন্ধনী অভ্যন্তরস্থ বীজ স্বাভাবিকভাবেই অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং নতুন করে বৃক্ষের চারা আত্মপ্রকাশ করে, বড় হয়, আবার ফুল ধরায় ফল ফলায়, এবং ফলের পতন ঘটিয়ে নবসৃষ্টির পটভূমি সৃষ্টি করে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই অদ্ভুত এক খেলা চলেছে। এর গোড়াতে রয়েছে সৎ-এর 'অহং' মধ্যভাগে সূক্ষ্মসত্তার 'অহং' এবং প্রান্তে বস্তুর 'অহং' এবং অন্তে স্থূল অহং তত্ত্বের লয় হয়ে শুদ্ধ চৈতন্যে মিশে যাবার 'অহং', যার ফলে লয়। জগতে সর্বত্রই রয়েছে এই অহং তত্ত্ব। ঈশ্বরের 'আমি' বোধের প্রকাশের জন্যই সৃষ্টি। স্থূল জগতের 'আমি' বোধের জন্যই প্রজন্ম, শিল্প, সাহিত্য, সব। লেখক তখন স্থূল জগতের 'আমিত্ব' বা 'অহং'-বোধ দ্বারা আক্রান্ত। সুতরাং নিজেকে তুলে ধরবার, অর্থাৎ প্রকাশ করবার জন্য শিল্প সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত, যাতে নাম হয়, প্রতিষ্ঠা হয় ইত্যাদি। বস্তুত জীবের অহংবোধকে সম্প্রসারিত করে দেবার জন্যই জগতে তার যত কাজ। তার প্রেম, প্রণয়, প্রীতি, ঘৃণা, যৌনতা সবই নিজেকে সম্প্রসারিত করার জন্য। আবার স্বাভাবিকভাবেই লেখকের মধ্যে একদিন যখন মুক্তির

আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, সেও সেই অহংবোধের জন্য। অর্থাৎ ক্ষুদ্র অহংতত্ত্বকে অনন্ত বিরাট অহংতত্ত্বে মিশিয়ে দিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য। লেখকের মধ্যে তখন স্থূল অহংবোধের খেলা চলেছে, সুতরাং 'বৃহৎ অহং'-তত্ত্বে আকর্ষণ বোধ না করে তিনি তখনও ক্ষুদ্র 'অহং' বোধেই ব্যস্ত থাকেন। অর্থাৎ পুঁথি পুস্তক খুঁজে নিজেকে প্রকাশ করার কাজে ব্যস্ত রইলেন। বিন্দুর মধ্যে যে সিন্ধু আছে, অনন্ত এক 'অহং' আছে সেই 'অহং' তত্ত্বে পৌঁছুবার চেষ্টা করলেন না। পঠন পাঠন এবং লেখক নিয়েই ব্যস্ত রইলেন।

বৃক্ষের পল্লবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যে প্রাণশক্তি মঞ্জুরিত হয়ে ফুল হয়ে ফুটতে চায়, ফল হয়, ফল বড় হয়ে পাকে, তারপর ঝরে গিয়ে নিজেকে ক্ষয় করে স্বাভাবিকভাবেই মহা অস্তিত্বে মিশে গিয়ে আবার নবসৃষ্টির অভিনয় করে, বৃক্ষ বোধ হয় তার কিছুই জানে না। এটা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়। বৃক্ষ পূর্ণ যৌবনে ফুটে উঠলেই তার মধ্যে অন্ধ সৃষ্টির আবেগ, ফুল ফোটায়, ফল ঝরায়, আবার লয় পেয়ে নতুন বৃক্ষ সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। একটি বৃক্ষ চারাগাছ থেকে মহীরুহ হয়ে ফুটে উঠতে বেশ সময় নেয়। একটি মানুষের জীবনও তেমনই মনুষ্যরূপেই নানা জন্ম জন্মান্তরের বৃত্ত পার হয়ে শেষ পর্যন্ত তার যথার্থ যৌবন প্রাপ্ত হয়। সেই যৌবনবৃক্ষে তার যে ফল ধরে সেই ফলই স্বাভাবিক নিয়মে একদিন বিরাট অহংতত্ত্বের সন্ধান পেয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে যে সেই মুক্তিরূপ অহং তার মধ্যে ফুটে ওঠে সে বোধহয় তা টের পায় না। অকস্মাৎ একদিন তা টের পেলে সে বুঝতে পারে যে, ফল হয়ে ঝরে পড়ে গলে যাচ্ছে। আবরণের অন্তরালে তার যথার্থ অহংতত্ত্বের প্রকাশ হচ্ছে অহং-এর স্বাভাবিক নিয়মে নিজেকে অনন্ত বিশ্বাসের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দিতে।

ভারতীয় শাস্ত্রমতে ৮৪ লক্ষ যোনি পার হয়ে সৃষ্টি সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর এবং স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই স্থূল রূপ 'অণু' পারস্পারিক সংযোগে নানা জড়বস্তু এবং জড়-বস্তু থেকে প্রাণছন্দে ছন্দায়িত বস্তু আকারে দেখা দেয়। সেই প্রাণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই মন ফোটে, মন থেকে অহংকার। এই ৮৪ লক্ষ যোনির শেষ যোনি মানব প্রজাতি। কিন্তু এই মানব প্রজাতি হিসেবে বহুবার তাকে জন্মমৃত্যুর বৃত্তে ঘুরতে হয়। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন যে মহা অনন্ত থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল সেই মহা অনন্তেই সে মিশে যায়। ডায়াগ্রাম আঁকলে মহাশূন্য থেকে ৮৪ লক্ষ যোনি বৃত্তের স্বরূপ দাঁড়ায় এই রকম ঃ—
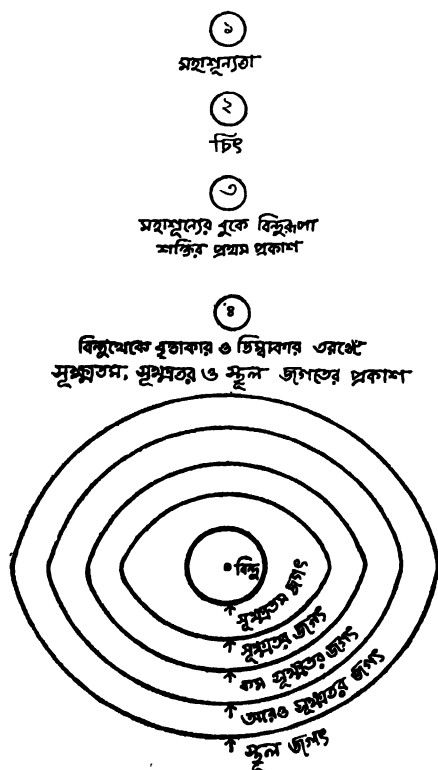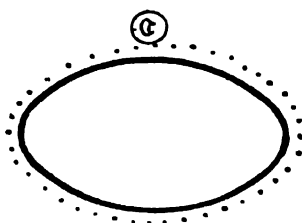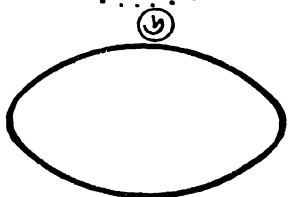
৫
ডিম্বাকার জগতের অনুপর্যায়
(জগৎ সম্প্রসারণের একান্নতম
পর্যায়)
৬
অনুর পারস্পরিক সংযোগে
ঘনীভুত বস্তু অবস্থা
৭
ডিম্বাকার ব্রহ্মাণ্ডের
প্রান্তভাগে প্রাণের
স্ফুরণ
৮
চলমান প্রাণের
আবির্ভাব
৯
ঢেউয়ের প্রথম চূড়ায়
মানুষের আবির্ভাব
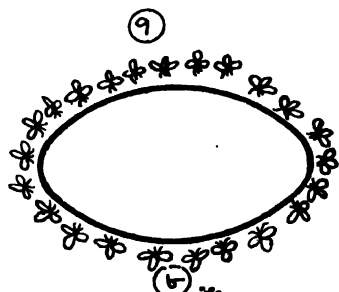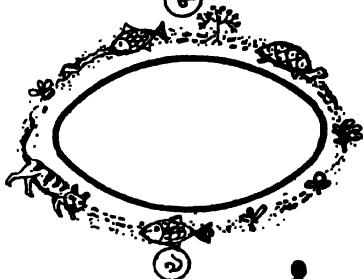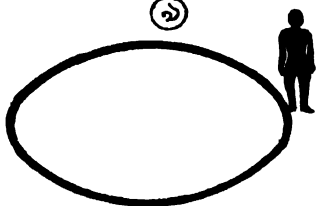
জগৎ সৃষ্টির একান্নতমবৃত্তে বস্তুজগতের উদ্ভব। বস্তু থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে অহংকার ইত্যাদির উদ্ভব। প্রাণবৃত্তের শেষ পর্যায় হল মানুষ। এই মানুষ জন্মবৃত্তের বহু পর্যায়ে ঢিলপড়া পুকুরের বুকে ঢেউয়ের মত ফুটে উঠে ডুবে যায়, আবার ওঠে, আবার ফোটে, আবার ডুবে যায়। এই ভাবে জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পুকুরের বুকে ফুটে ওঠা ঢেউয়ের ন্যায় শেষ বারের মত ফুটে উঠে সেই যে ডুবে যায়,
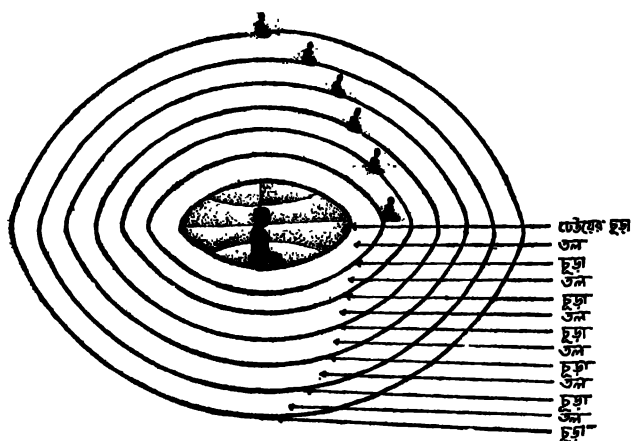
আর বৃত্ত-তরঙ্গ সৃষ্টি করে ফুটে ওঠে না। যে শূন্য থেকে তার উদ্ভব সেই শূন্যেই সে লুপ্ত হয়। যে মানুষ জন্ম-বৃত্তের বহু বৃত্ত পার হয়ে ক্রমশ শেষ দিকে চলে এসেছে তারই মধ্যে মহাশূন্য-তার অর্থাৎ মুক্তির টান বেশী করে অনুভূত হয়। অর্থাৎ তারই মধ্যে অধ্যাত্ম আবেগ বেশী করে ফুটতে থাকে। বৃক্ষ যেমন ফুল ও ফল ফোটাবার আবেগ সহজে ধরতে পারে না, মানুষও তেমনই নিজের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে মুক্তির আবেগ ফুটে ওঠার স্বরূপ বুঝতে পারে না। কিন্তু একদিন তা ফুল হয়ে, ফল হয়ে ঝরে পড়ার মুখে এলে অকস্মাৎ তার চৈতন্যোদয় হয়। লেখকেরও

বোধহয় ব্যাপারটা ছিল সেরকমই। কারণ, বিন্দুধ্যানের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে, ভেতরে তার শূন্যের ডাক এসে পড়েছে স্বাভাবিক নিয়মে, অর্থাৎ বহু জন্মবৃত্ত-তরঙ্গ পার হয়ে তিনি শেষ দিকের ঢেউয়ের চূড়ায় এসে পেঁাছেছেন। সেই জন্যই স্বাভাবিকভাবে যখন নতুন করে তার ডাক এল, এবার নতুন সংযোগ ঘটালেন লেখকেরই একজন প্রকাশক। একদিন তিনি লেখককে বললেন, অদ্ভুত এক লোকের দেখা পেয়েছি, যিনি সূক্ষ্ম দেহে আকাশ পরিভ্রমণ করতে পারেন। যাবেন নাকি, চলুন। লেখক জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বুঝতে পারলেন যে, তিনি সূক্ষ্ম দেহে পরিভ্রমণ করতে পারেন?

প্রকাশক তখন লেখকে সেই অদ্ভুত লোকটি সম্পর্কে যে কথা বললেন, তা নিম্নরূপ ঃ

কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনে লেখক কলকাতার আশেপাশেই কোন এক স্থানে সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিটি হিমালয়ে নাকি অনেক দিন সাধনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন এক প্রবাদপুরুষ স্বরূপ যোগীর সঙ্গে তিনি রক্তের সম্পর্কে যুক্ত। তবে গৃহী। গৃহীর মতই থাকেন। সাধারণ মানুষের মত চেহারা। ধুতি পাঞ্জাবী পরেন। কখনও কখনও রক্তবস্ত্র পরিধান করে পুজো-আর্চা করেন। সেই ব্যক্তিটি প্রকাশককে দেখে নাকি অনেক কথা বলেছেন। এবং বলে দিয়েছেন যখনই তাকে চিন্তা করা হবে তখনই তিনি সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে উপস্থিত হবেন। কিন্তু প্রকাশকটি তাঁর কথা তেমনভাবে চিন্তা করেন নি। একবার তিনি ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াতে সেই ব্যক্তিটির কথা চিন্তা করেন। তখনই দেখেন যে, তাঁর শিয়রে সেই সাধক পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর ভাল হয়ে যখন তিনি তাঁর কাছে যান, সাধকটি বলেন, কি? জ্বরে কেমন কষ্ট পেলেন? গঙ্গাস্নান করে তবে শরীর জুড়োই।

প্রকাশকটির সেই কাহিনী শোনার পর লেখকের সেই গৃহী সাধকটির প্রতি দারুণ আগ্রহ জন্মে। এরপর তিনি তাঁর কাছ থেকে সাধকটির ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর কাছে যান। তিনি তখন বিশ্রাম করছিলেন। প্রকাশকের লেখা একটি চিঠি দেখার পর অসময় হলেও সাধকটি দেখা করেন।

সাধকটির দেহে একটি রক্তাভ ভাব আছে। ক্ষীণ কটি। বিস্তৃত বক্ষ। চোখেও দীপ্তি আছে। কিন্তু চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ। সাধকের বুকে কোন লোম নেই। এটা লোক মতে নিষ্ঠুরতার লক্ষণ।

লেখক ভেবেছিলেন, তাকে দেখা মাত্র সাধকটি কিছু বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি সেরকম কিছু বলতে পারলেন না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, যোগে বসে তারপর বলবেন। যোগে বসে কিছু বলার অর্থ, সাধনমার্গের প্রাথমিক পর্যায়ে এরা বিচরণ করেন। সাধকের খুব যে একটা শক্তি আছে তা নয়। সুতরাং লেখকের উপর তিনি খুব যে প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন, তা নয়। লেখক জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছি, আপনি সূক্ষ্ম দেহে বিচরণ করতে পারেন?

সাধকটি জবাব দিলেন, অনেকে সেরকম বলেন।

—আপনাকে চিন্তা করলেই নাকি আপনি তাকে দেখা দেন?

সাধকটি সরাসরি সে-কথার জবাব এড়িয়ে বললেন, কেউ আমাকে খুব চিন্তা করলে তক্ষুনি কেমন সাড়া পাই।

—আমি আপনাকে চিন্তা করলে দেখতে পাব?

—সকলকে দেখা দেওয়া যাবে না।

—কেন?

—সে কথা আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

কথাবার্তা বলে লেখক যে খুব বেশি প্রভাবিত হলেন, তা নয়। সুতরাং ফিরে এলেন। লেখকের সঙ্গে এই কথাবার্তা বলার

সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী, শ্রীযুক্ত রথীন রায়।

ইতিমধ্যে লেখক শহরতলি অঞ্চলে আর একজন সাধকের কাছে গেলেন। মূলত তিনি চাকুরীজীবী। কিন্তু বাড়তি আয়েরও একটা ব্যবস্থা আছে—জ্যোতিষ গণনা। সেই সূত্রেই লেখক তাঁর সম্পর্কে প্রথম শুনতে পান। তখনও সাধকজগৎ সম্পর্কে তিনি যে খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তা নয়। সেখানে গেলেন সেই জ্যোতিষী সাধককে বিচার করতে এবং তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে। জ্যোতিষ সাধক তাঁর হাত দেখলেন এবং জ্যোতিষিদের সেই চিরাচরিত কথাই বলে গেলেন, অর্থাৎ আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একদিন খুব বড়······ইত্যাদি।

এধরনের খুশি করা বাক্যে লেখকের কোন আস্থা ছিল না। সুতরাং তিনি খুব বেশি আশান্বিত হতে পারলেন না। তবে জ্যোতিষী তাঁকে আর একটি যে কথা বললেন, সেই কথাটিই তাঁর মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল—'একটু ধ্যানে বসুন না।'

লেখক বললেন, ধ্যানে বসে কি হবে?

—বসুন, দেখুন কি হয়।

যে অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিধর সাধকের রূপ কল্পনা করে লেখক জ্যোতিষী সাধকটির কাছে এসেছিলেন—তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশই হলেন। যেমন ছিলেন তৈলঙ্গ স্বামী, যেমন ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী, যেমন ছিলেন রাম ঠাকুর, তেমন কিছুই নেই এ-সব লোকের মধ্যে। লেখকের মনে সন্দেহ দেখা দিল—আসলে এরকম কোন সাধক কখনই ছিলেন না? না, এঁদের সম্পর্কে রচিত কাহিনী শিষ্যবর্গের তৈরি করা গল্প—যে গল্পের সাহায্যে একটি order বা সম্প্রদায় তৈরি করা যায়? সম্প্রদায় তৈরি করে দু পয়সা কামানো যায়?

ইতিমধ্যে লেখক হিল্লী দিল্লীও বেশ কিছুদিন ঘুরে এসেছেন।

কাশীতে কোন সাধুরই সন্ধান পাননি। মথুরা বৃন্দাবনেও তথৈবচ। হরিদ্বারে কাক চরিত্র জানেন এমন ধরনের দু একজনের দেখা পেয়েছিলেন।—এর বেশি নয়। হিমালয়ের কোলে বেশ কিছুদিন ঘুরেও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং —

তিন

সুতরাং সহস্র চেষ্টা করেও যখন ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না, —একদিন তখন লেখক হঠাৎ ভাবলেন, দেখাই যাক না কেন, বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে কোন শক্তি আছে কিনা? ঐ যে ধ্যানট্যান কি বলে! দেখাই যাক না একদিন বসে, কি আছে? সুতরাং একদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাবার আগে লেখক পদ্মাসনে বসে দুই ভুরুর মাঝখান বরাবর সামনের দিকে মনটাকে দূরে কোন এক জায়গায় ফেলে দেখবার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য! তক্ষুনি এক অদ্ভুত ঘটনা! লেখকের যেন মনে হল অন্ধকার ভেদ করে বহু দূরে গাঢ় নিশীথ আকাশের নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে একটি ছোট নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তক্ষুনি লেখকের মনে পড়ে গেল সেই দীর্ঘাঙ্গ সাধকটির কথা—যিনি তাঁকে বিন্দু ধ্যান করতে বলেছিলেন। এই কি সেই বিন্দু! প্রচণ্ড কৌতূহলে লেখক সেই বিন্দুটির দিকে মানসনেত্রে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হল বহু দূর থেকে একটি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু যেন ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। যতই এগিয়ে আসছে, ততই যেন তার ব্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। ততই তা স্পষ্ট হচ্ছে। ক্রমেই তার ব্যাসের পরিধি ঘিরে নীল সবুজে মেশানো একটা জ্যোতির্বৃত্ত রচিত হচ্ছে। এগিয়ে আসতে আসতে সেই বিন্দুটি যেন কয়েক হাত

দূরত্বের মধ্যে এসে ব্যাখ্যাতীত একটা কৌতূহল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকল। লেখকের আন্তর কৌতূহলের তখন যেন কোন সীমা নেই। বিস্ময়ে বিমূঢ়ভাবে তিনি সেই দিকে মানসনেত্র ফেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অকস্মাৎ বিন্দুটি পেছন-দিকে হটতে হটতে আবার কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

লেখক ভাবতে লাগলেন এটা কি? প্রত্যেক লোকই কি চোখ বুজলে সেই বিন্দু দেখতে পায়? লেখক চোখ মেলে তাকালেন। ঘরের অভ্যন্তরে তখন নিরন্ধ্র অন্ধকার। লেখক আবার চোখ বুজলেন। দেখবার চেষ্টা করলেন বিন্দুটি আবার আসে কিনা। কিন্তু না, বিন্দু আর নেই। শুধু অন্ধকার। ঋগ্বেদের সেই নাসদীয় সূক্তের মত অন্ধকার যেন ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন। কিছুই দেখা যায় না। যেন কেউ ঘন আলকাতরা ঢেলে দিয়ে রেখেছে চোখের উপর। তাহলে আগের বার চোখ বুজে লেখক কি দেখলেন? সেটা কি ভ্রান্তি! নিজের মনেরই প্রতিফলন! অদ্ভুত জেদ চেপে গেল লেখকের। এ রহস্যের একটা কিনারা করতেই হবে। দেখা যাক আবার সেই আলোক-বিন্দুটিকে দেখা যায় কিনা। এর একটা কিনারা না করে তিনি উঠছেন না। প্রায় ঘণ্টাখানেক লেখক সামনের অন্ধকারে মনকে ফেলে রেখে বসে রইলেন। অন্ধকারের প্রান্তদেশ পর্যন্ত মনকে ছড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন সত্যিই কিছু আছে কিনা। যখন ভয়ানক ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হয়ে উঠছেন তিনি এমন সময় হঠাৎ যেন মনে হল সকালবেলা পুরীর সমুদ্রে দিক্‌চক্রবাল থেকে অকস্মাৎ যেমন প্রভাত সূর্য লাফিয়ে উঠে, তেমনই যেন অন্ধকারের প্রান্তদেশ থেকে ক্ষুদ্র একটি বিন্দু উঁকি দিয়ে উঠল। উঠে দুই ভুরুর মাঝ বরাবর দীর্ঘ এক সরলরেখার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। এবার আর কাছে এগিয়ে এল না। মিট্‌মিট্‌ করে যেন সেই অন্ধকার দিগন্ত থেকেই হাসতে লাগল। ভাবখানা

এই, কি মনে হচ্ছে? লেখক সহজ সরল রেখায় দীর্ঘ এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে সেই বিন্দুকে যেন বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলেন, যাতে সে পালাতে না পারে।

অদ্ভুত! বিন্দুটি তখন নড়ছে! কখনও যাচ্ছে ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। কখনও উঠছে উপরে, কখনও নামছে নিচে। আবার কখনও মেঘের ফাঁকে চাঁদ যেমন ডুবে যায় তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার সিন্ধুতে বিন্দুর এ এক অদ্ভুত বিচিত্র খেলা। ছেলেদের কানামাছি খেলার মতই কৌতূহলপ্রদ। এক সময় সেই ধরা ছোঁয়ার খেলা খেলতে খেলতে সে যেন হারিয়ে গেল। নতুন করে যেই লেখক তাকে ধরতে যাবেন ঠিক তক্ষুনি ঊষালগ্নে কয়েকটি কাকের চিৎকার শুনে তিনি চমকে গেলেন। একি! এ যে রাত কেটে ভোর হয়ে এসেছে! চমকপ্রদ এক বিস্ময়ে ঊষালগ্নের স্নিগ্ধতায় লেখক বসে বসে গত সারা রাতের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে লাগলেন।

লেখকের মধ্যে একটা নেশা চেপে গেল যেন। প্রত্যেক রাতেই খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর মন ছুটে যেতে লাগল সেই অলৌকিক দর্শনের দিকে। কারো কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও তিনি বসে যেতে লাগলেন পদ্মাসনে। দুই ভুরুর মাঝ বরাবর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে মানস নেত্র ফেলে রাখতে লাগলেন যতদূরে তাঁর মানস-চারণা তাঁকে নিয়ে যেতে পারে। আশ্চর্য! সেই অন্ধকারে মানসদৃষ্টি বরাবর কোন এক সীমান্ত থেকে অকস্মাৎই যেন উঠে আসতে লাগল একটি বিন্দু। সন্ধ্যাবেলার আকাশে যেমন প্রথম আলোকবিন্দুরূপী গ্রহ বা নক্ষত্র ফুটে ওঠে তেমনই। যেন বিন্দু নয়, একটি কৌতূহলী আলোর চোখ, এমনই মনে হত লেখকের। এমন সজীব ও রহস্যময় বিন্দুর কথা যেন চিন্তা করাও যায় না। সে স্থির নয়, সচল। কখনও সরে যাচ্ছে ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও ঊর্ধ্বে, কখনও বা নিম্নে। সেই বিন্দু যেদিকেই ঘুরুক

না কেন লেখকও তার মানসনেত্র চলমান বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরাতে লাগলেন।

কিছুদিন এইভাবে চলার পর বিন্দু যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। যেন সংশয় ও ভীতি কাটিয়ে ক্রমশ সে যেন লেখকের সঙ্গে একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাছে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'পা এগোয় তো তিন পা সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যায়। ভাবখানা এই—লেখককে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই রহস্যময় হাতছানির এত নিবিড় আকর্ষণ যে, তাকে অস্বীকার করে চলা যেন প্রায় অসম্ভব। বিন্দুর প্রতি লেখকের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়তে লাগল।

শুধু বিন্দু নয়, দেখা গেল সেই অন্ধকারও কিছুদিনের মধ্যে প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হতে আরম্ভ করেছে। অন্ধকারও কেমন যেন স্নিগ্ধ ও রহস্যময় হয়ে উঠছে। একদিন সেই অন্ধকারের মধ্যে লেখক অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে রীতিমত শিহরিত হয়ে উঠলেন। অন্ধকারের অন্তস্তল থেকে একদিন যেন নীল সবুজে মেশানো এক আশ্চর্য রঙের রেখায় আঁকা চোখ ফুটে উঠল। তারপর প্রাণবন্ত সেই চোখটি জ্বলজ্বল চোখে রহস্যময় ভাবে লেখকের দিকে তাকিয়ে থাকল। অদ্ভুত একটি মাত্র চোখ, অন্য চোখটি যেন অন্ধকারের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা। প্রথমটা এ-চোখ দেখে লেখক চমকে উঠেছিলেন। এ-চোখ কার? অনন্ত অন্ধকারের বুকে এ চোখ ফুটে উঠে তাঁর দিকে অমন করে তাকিয়ে থেকে কী ইঙ্গিত দিতে চাইছে? যেন অন্ধকারের বুকে লুক্কায়িত অনন্ত রহস্য সামান্য মাত্র উঁকি দিয়ে বলতে চাইছে, অন্ধকার অন্ধকার নয়। তার মধ্যে রয়েছে পূর্ণ এক চৈতন্য। সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত সে সব দেখে, লক্ষ্য রাখে। চেষ্টা করলে মানুষ
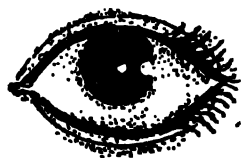
ধ্যানে দৃষ্ট চোখ

এই অন্ধকারের মধ্যে ডুবুরির মত ডুব দিয়ে অনেক কিছু পেতে পারে, সেই একচক্ষু রহস্য যেন সে কথাই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইল। সেই এক-চক্ষু-রহস্যের সঙ্গে লেখকের যখন মানসনেত্রের দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে তখনও বিন্দু কিন্তু অন্তর্হিত হয়নি। একটি চঞ্চল ছেলের মত সে আসছে, ছুটে বেড়াচ্ছে অনন্ত অন্ধকার আকাশে। সেই রহস্যময় চোখটি আড়াল হয়ে গেলেই সে যেন স্পষ্ট করে ফুটে উঠে বলতে চাইছে, আমাকে দেখ, অনুসরণ কর, অনেক রহস্য জানতে পারবে। কিন্তু লেখক যেইমাত্র তার দিকে মানসনেত্রে স্থির হয়ে বসতে চাইছে অমনি যেন দুষ্টু এক কিশোরী মেয়ের মত সে পালিয়ে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। লুকানো মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে অকস্মাৎ তার দেখা পেয়ে চিত্ত যেমন আনন্দে দুলে ওঠে, তেমনই ভাবে হঠাৎই আবার দেখা দিয়ে সে যেন লেখকের চিত্তে অভূতপূর্ব এক সাড়া তুলছে।

এই কানামাছি খেলার মধ্যেই কখনও কখনও আরও বেশি রহস্যময় দৃষ্টি নিয়ে ফুটে উঠছে সেই চোখটি। তখন লেখক কাকে দেখেন, 'বিন্দু' না 'চোখ' ভাবতে ভাবতে কখন হয়তো দুইই এক সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ হারিয়ে গেলে যেমন অনুশোচনা হয় সেরকম একটি অনুশোচনায় লেখক ভারাক্রান্ত হতে যবেন এমন সময় হয়তো দেখলেন—হয় বিন্দু নয়তো সেই চোখটিই আবার ফিরে এসেছে।

এই লুকোচুরি খেলার মধ্যেই হঠাৎ লেখক আর একদিন আরও একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখে যেন অনেক বেশি রকমে চমকে উঠলেন। অন্ধকারের আস্তরণ তখন ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। যেন, এক ধরনের তরল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে তাকালে জলে ডুব দিয়ে দেখলে যেমন দেখা যায় তেমনই অনেক কিছু দেখার ইঙ্গিত মিলছে। সেই পাতলা অন্ধকারের মধ্যেই লেখক একদিন স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটি হাত। সেই হাতের

করতল টকটকে লাল। কিন্তু তার পৃষ্ঠদেশ ঘন আলকাতরা বর্ণের। মায়ের দক্ষিণ হাতে যেমন আশীর্বাদের ভঙ্গী থাকে ঠিক যেন তেমনই। শুধু যে সেই হাত, তাই নয়, তার সঙ্গে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে স্নিগ্ধ ধূপের গন্ধ। এ কার হাত! লেখকের বিস্ময়ের কোন যেন সীমা থাকল না। বেশ কয়েক দিন চলল এই খেলা। চোখ তখন উধাও, তার স্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাত, এবং সেই সঙ্গে সুবাসিত ধূপের গন্ধ। লেখকের বুঝতে বাকি থাকল না যে, এ হাত স্বয়ং জগজ্জননীর হাত। তাহলে কি মাতৃরূপ মিথ্যে নয়? অতীন্দ্রিয় দৈবীসত্তা অসত্য নয়? স্থূল ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে মুগ্ধ জীব তার অন্তরের দিকে তাকাতে পারেনি বলেই মিথ্যে বস্তুবাদের জালে জড়িয়ে আছে?

মায়ের আশীর্বাদের হাত

লেখকের সেই পরম বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আরও রহস্যময় এক দৃশ্য দেখে তিনি যেন চমকে উঠলেন। অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে এসেছে আরও। অন্ধকার নয়, যেন ছায়া ছায়া এক পাতলা আয়না। তার মধ্যে একদিন প্রতিবিম্ব আকারে ফুটে ওঠা নিজেরই চিত্র দেখে লেখক যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। যেন একটি আয়না, তাতে লেখকের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ এক অদ্ভুত প্রতিবিম্ব। এ প্রতিবিম্বে দেখা যাচ্ছে, কিছুটা কাৎ হয়ে বসে থাকা নিজেরই পেছন দিকটা। একি! একি অদ্ভুত রহস্য! এসব ঘটছে

ধ্যানে পাশ্বর্দেশ থেকে লেখকের নিজেকে অবলোকন

কি ! লেখক যেন কোন বিচার বিশ্লেষণ বা হিসেবের মধ্যেই এ দৃশ্যকে আনতে পারলেন না। লেখকের প্রতিবিম্ব নিয়ে এই দ্বৈত সত্তাটি কে ? এই কি লেখকের সূক্ষ্মদেহ ? যে দেহে যোগীরা আকাশ পরিভ্রমণ করে থাকেন ? পরবর্তীকালে লেখক একজন যোগী সাধকের কাছে জানতে পেরেছিলেন যে, এই চোখ লেখকের নিজের অভ্যন্তরের পরমাত্মার চোখ। একটি মাত্র চোখ দেখিয়ে সে বলতে চাইছে যে, পরমাত্মার সামান্য একটু অংশই তোমার কাছে জ্ঞাত। অধিকাংশই রয়েছে তোমার জ্ঞানবৃত্তের বাইরে। পেছন দিকে কাৎ হয়ে বসা ভঙ্গিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার অর্থ, নিজেকে আংশিকভাবে জানা। অন্তরের অভ্যন্তরে নিঃসঙ্কোচে ডুবে যেতে পারলে তবেই এক চোখের জায়গায় দুই চোখ দেখা যায়, অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান হয়, পেছনের বদলে নিজেকে সামনাসামনি দেখা যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্যেই ভারতের সাধক ঋষিরা বলে গেছেন: 'আত্মানং বিদ্ধি' 'know thyself', অর্থাৎ অন্তরের অভ্যন্তরে ডুব দাও—'ডুব্ ডুব্ ডুব মনসাগরে আমার মন।'

কয়েকদিন চলল নিজেকে দেখার এই অদ্ভুত খেলা। অন্ধকার ততক্ষণে যেন রূপ পাল্টেছে। ঘন তমিস্রা ক্রমশ স্বচ্ছ ও পাতলা হয়ে আসছে। এরই মধ্যে যেন অস্পষ্ট ছায়ার মত সব অতীন্দ্রিয় প্রাণীর পদচারণা চলেছে। কখনও কখনও আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে সেই চোখটি। আরও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য নিয়ে যেন সেই চোখটি লেখকের দিকে তাকাচ্ছে। ক্রমশ যেন্ লেখকের প্রতিবিম্বটি জীবন্ত প্রতীয়মান হচ্ছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লেখকের কেমন যেন একটি ঘোর লেগে যাচ্ছে। ফলে চোখের পাতা দুটো যেন ঘন ঘুমে জড়ানো রসের ভারে ক্লান্ত হয়ে একে অপরের উপর লেপ্টে যাচ্ছে। চোখের পাতা দুটো ঘন ও ভারি হয়ে উঠে পরস্পর পরস্পরের উপর এমন চাপ

সৃষ্টি করছে যে, অকস্মাৎ দুটি দ্রব্যের ঘর্ষণের ফলে যেমন হঠাৎ আলো চমকে ওঠে তেমনই মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত চোখ ঝল্সানো আলো চমকে উঠছে। তার এমন দীপ্তি যে, চোখ অন্ধ হয়ে গেল কিনা এমন ভয় হয়। লেখক আবার চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যেই দৃষ্টি ফেলে পরখ করে নিতে চাচ্ছেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি অনাহত আছে কিনা। যখন নিশ্চিন্ত হচ্ছেন যে, তার চোখের দৃষ্টি হারায়নি তখন আবার অনন্ত অন্ধকারের রহস্যময় আহ্বানে মানসদৃষ্টি মেলে দেবার জন্য চোখ বুজছেন। যেন ফাল্গুনের হাওয়ায় কোথা থেকে ভেসে ভেসে ধূপের গন্ধ আসছে। আকাশের বুকে সন্ধ্যা তারার মত বিন্দুটি তখন বড় হয়ে উঠছে।

আশ্চর্য! বিন্দুটি একদিন যেন অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর ছবি এঁকে দাঁড়াল লেখকের মানসনেত্রের সামনে। বহুদূর অন্ধকার
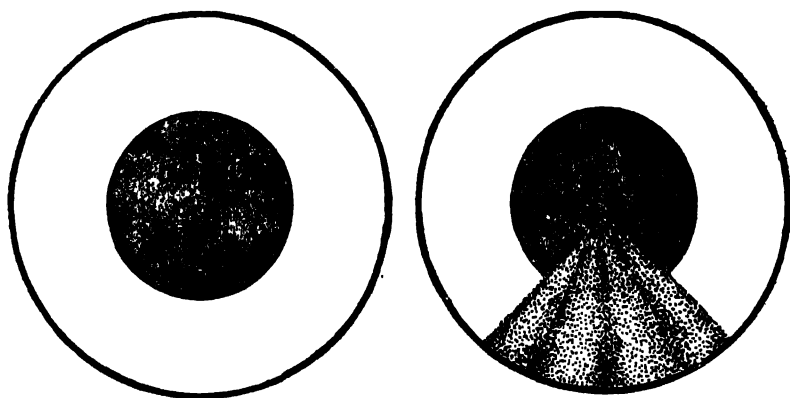
বিন্দু-বৃত্তের মধ্যে অন্ধকার

বিন্দুর মধ্য থেকে গোলাকার ধূম্রপুঞ্জ

এক দিগন্ত থেকে বিন্দুটি যেন ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসতে লাগল। যেন তার শুভ্র ক্ষুদ্র দেহটির প্রান্তদেশ সবুজ

সবুজ আলোর সংকেত ছড়াতে ছড়াতে স্ফীত হয়ে একটি বৃহত্তর
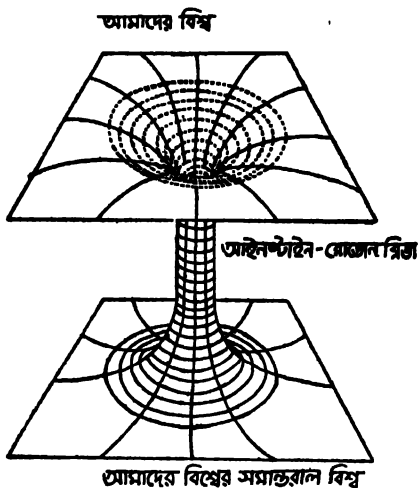
বৃত্ত রচনা করতে লাগল। সেই বৃত্তের মাঝখানে ভয়ানক অন্ধকার। অকস্মাৎ দেখা গেল সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করে জ্যোতির্ময় ধূম্রপুঞ্জ বেরিয়ে আসছে। সেই ধূম্র-পুঞ্জ আবার বৃহত্তর এক জ্যোতির্বৃত্ত রচনা করছে। আবার সেই বৃত্তের ক্রমবর্ধমান পরিধির মধ্যস্থ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে সবুজের আভা মিশ্রিত জ্যোতির্ময় নীলাভ ধূম্রপুঞ্জ। আবার সেই ধূম্রপুঞ্জ বৃহত্তর বলয় সৃষ্টি করছে। তার মাঝ থেকে অভূতপূর্ব অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। সেই অন্ধকার থেকে আবার বেরিয়ে আসছে ধূম্রপুঞ্জ। একি বিচিত্র ঘটনা! দেখে যেন লেখকের বিস্ময়ের অন্ত থাকছে না।*

বেশ কয়েক দিন শুধু সেই খেলাই চলল। বৃত্ত ক্রমশ বড় হচ্ছে। ভেতরে যেন প্রলয় অন্ধকার! সেই অন্ধকার থেকে ক্রমশ অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি বেরিয়ে এসে লেখককে টানতে চাচ্ছে। যেমন করে চুম্বক লোহাকে টানে ঠিক যেন তেমনই আকর্ষণ। সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করে সেই অন্ধকার যেন গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। বিজ্ঞানে যে ব্ল্যাক হোলের অভূতপূর্ব

* এই বৃত্তাকার ধূম্রপুঞ্জ আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের Blackhole থেকে নির্গত আলোকবৃত্তের মত দেখতে। যাকে বৈজ্ঞানিকরা 'আইনস্টাইন-রোজেন-ব্রিজ' নাম দিয়েছেন।

আকর্ষণের কথা শোনা যায় লেখকের মনে হতো এ যেন সেই ধরনের আকর্ষণী অন্ধকার। ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন নিউট্রন স্টারের অস্তিত্ব জানতে পেরে। নিউট্রন স্টারের ঘনত্বের পাশে তুলনা করলে পৃথিবীর ঘনতম বস্তুও **vacuum** বা শূন্যতা রূপে প্রতীয়মান হবে। বৈজ্ঞানিকেরা তাই প্রশ্ন তুলেছেন, এমন কি কোন বস্তু আছে যা স্থায়ী নিউট্রন স্টার গঠনের ক্ষেত্রেও কঠিনতম বা ঘনতম বলে মনে হবে? এর কি কোন মাধ্যাকর্ষণী ক্ষমতা আছে যার ফলে সেই ঘনীভূত বস্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে? তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াবে কি? জ্যোতির্বিদেরা একটা তাত্ত্বিক জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। এ থেকে ব্ল্যাক হোল তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে এখানে বস্তু ও শক্তি এত বেশিরকম ঘনীভূত হয়ে আছে যে, সেই কঠিন বন্ধন থেকে কিছুই বেরিয়ে আসতে পারবে না। সেই ঘনীভূত বস্তু ও শক্তিই ব্ল্যাক হোল। আসলে ব্ল্যাক হোল কোন বস্তু না শূন্যতা, বৈজ্ঞানিকেরা এবিষয়ে কোন ধারণাই করতে পারেন নি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর তার কাজ করতে পারছে না এ বস্তুর অস্তিত্ব অকল্পনীয়। নিউট্রন স্টারের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণাই দিক না কেন আসলে ব্ল্যাক হোল মূলত ব্ল্যাকবডি তত্ত্বের কাছাকাছি। ভারতীয় যোগীরাই একমাত্র বোধহয় এই তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। ভারতীয় যোগীদের সেই অভিজ্ঞতার কথা বলার আগে ব্ল্যাকবডি তত্ত্বের মূলকথা বলে নেওয়া যাক। ব্ল্যাকবডি মানে এই নয় যে, এ কোন কৃষ্ণবর্ণ বস্তু। এটা এমনই জিনিস যা আলোকশক্তিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ বা অভ্যন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিকীর্ণ করে দিতে পারে। আলোর যে তরঙ্গই তার উপর পড়ুক না কেন, সে তা গ্রাস করতে পারে। আবার উত্তপ্ত হলে সম্পূর্ণ আলোকতরঙ্গ নিঃশেষ ভাবে নিঃসৃত করে দিতে পারে। আসলে ব্ল্যাক হোলই বলা যাক বা ব্ল্যাকবডিই

বলা যাক, এক মাত্র শূন্যতাই হল সেই জিনিস। এরই আকর্ষণ যখন চূড়ান্ত তখন তার আকর্ষণী ক্ষমতাকে কোন হিসেবের মধ্যেই আনা যায় না। সেই ক্ষমতা তখন শূন্যতার মধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকে। তার বিকর্ষণী ক্ষমতা যখন চূড়ান্ত, তখন নিজের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে নিঃশেষিত করে দিয়ে সে ঠেলে দেয়। শক্তি তখন বর্ণতরঙ্গ সৃষ্টি করে জগৎরূপে ফুটে ওঠে। শূন্যের মধ্যে শক্তির দুটি charge রয়েছে, Positive ও Negative. প্রত্যেকটি chargeই দেশের চারদিকে একটি আলোড়ন বা অবস্থা তৈরি করে। অন্য আর একটি charge সেখানে উদ্ভূত হলেই সেজন্য সে আকর্ষণ বোধ করে। এর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানে তাকেই বলা হয়েছে field. দুটি চার্জের সংঘর্ষ অকল্পনীয় শক্তিতরঙ্গ সৃষ্টি করে। সকল জিনিসের মধ্যেই এই দুটি চার্জ রয়েছে। মানুষের দেহেও। তার বাম অঙ্গে নেগেটিভ ও দক্ষিণ অঙ্গে পজিটিভ চার্জ রয়েছে। দুটি হাত একত্র করলেই দেহে শক্তি সঞ্চারজনিত একটি শিহরণ হয়। সেই শিহরণ একটি দিব্যভাবে স্নিগ্ধ বলে হিন্দুরা জোড় হস্তে প্রণাম করে। সেই মহা নিষ্ক্রিয় শূন্যতা তখন থাকে জগৎ-বৃত্তের বাইরে এবং ভেতরেও। মহা শূন্যতাতে যে শুধু একটি মাত্র ব্রহ্মাণ্ড আছে তা নয়। মহা অম্বরে অন্ধকারের বুকে ফুটি ফুটি যে-সব আলোক বিন্দু দেখতে পাই তা হয়তো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। দুই আলোক বিন্দুর মধ্যস্থ অন্ধকার হয়তো মহাশূন্যতা। কোথাও এই শূন্যতা নিজের বুক নিঃশেষিত করে অন্তর্স্থিত শক্তিকে নিঃশেষে নিজেরই মধ্য থেকে বের করে দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছে। আবার কোথাও হয়তো নিঃশেষে জগৎকে শুষে নিয়ে আপন মহাশক্তিধর অন্ধকারকে প্রকট করে দিয়ে দুই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানকে আপনার যথার্থ মহিমায় প্রকাশিত করে দিয়ে আছে। এই মহা অন্ধকারই

চূড়ান্ত ঘনীভূত বস্তু। এই মহা অন্ধকারই চূড়ান্ত বস্তু-নিঃশেষিত নির্গুণ। বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশই শূন্যতা। ইদানীং তো প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তু অবস্তুরূপ শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তা হলে শক্তিই বা কেন নির্গুণ শূন্যতার পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবে না? অথচ মানুষের বিশ্লেষণী বিচার বুদ্ধিতে এর কোন হদিস হবে না, যদি না মানুষ শূন্যতার সঙ্গে নিজের সমগ্র সত্তাকে মিলিয়ে দিয়ে পূর্ণ শূন্যতা হতে পারে। যেমন, যতই অঙ্কের হিসেবে আসুক না কেন, মানুষের চিন্তাতে আইন-স্টাইনের চতুর্মাত্রিক অবস্থার স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়। অথচ চতুর্মাত্রিক কেন, বহু মাত্রিক অবস্থাও আছে। এই জন্য বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা ২৬টি মাত্রার কথা বলেছেন। এর মধ্যে দশটি স্বীকৃত। যেমন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, দেশ-কাল, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স, স্ট্রং নিউক্লিয়র ফোর্স, উইক নিউক্লিয়র ফোর্স, মাধ্যাকর্ষণ, চৈতন্যশক্তি ও শূন্যতা। মানুষের চৈতন্যে তা সহজেই ধরা পড়ে। এমনতর অদ্ভূত অদ্ভুত জিনিস ধরা পড়ছে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের কাছেই। লেখকের অগ্রজ সাহিত্যিক বন্ধু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় একদিন লেখকের কাছে নিয়ে এসে-ছিলেন তাঁর এক চিত্র পরিচালক বন্ধু বীরেশ চ্যাটার্জিকে। তিনি বসেছিলেন লেখকের মুখোমুখি। লেখক তাঁকে বললেন, আপনার পিঠে কি হয়েছিল? দাগ রয়েছে? বীরেশবাবু বললেন, বহুদিন আগে ভয়ঙ্কর কার্বাঙ্কল হয়েছিল, প্রাণান্তকর ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হল লেখক কি করে সামনে বসে থেকে একটি মানুষের চতুর্থ মাত্রার ছবি দেখতে পেলেন? যা বৈজ্ঞানিকের অঙ্কের হিসেবে অনুমিত হয়, তা দেহতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির স্বাভাবিক দৃষ্টির মধ্যেই ধরা পড়ে। একটা মানুষের চৈতন্য সত্তা শুধুমাত্র চতুর্মাত্রিক কেন বহুমাত্রিক হতে পারে, যদি তিনি শূন্যস্থ হতে পারেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হতে পারেন। সেইজন্য শূন্যতাই

হল পূর্ণতা। শূন্যতা পূর্ণতার বিপরীত নয়। সে কথা যাক। সেই শূন্যতার পথে অগ্রসর হতে গিয়ে সমাধিস্থ হবার পূর্বে লেখকের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলা যাক—যোগচর্চা কালে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্যই বর্তমান গ্রন্থ লেখার প্রয়াস দেখা দিয়েছে।

সেই অন্ধকারোদরস্থ জ্যোতির্বৃত্ত কয়েকদিন ধরেই অদ্ভুত খেলা খেলে চলল লেখকের সঙ্গে। বৃত্তের সেই পরিধি যতই দিনের পর দিন বৃহত্তর হতে লাগল ততই যেন বৃত্তস্থ অন্ধকারের আকর্ষণ বেশি করে বাড়তে লাগল। একদিন মনে হল নিজের চৈতন্য সত্তাকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। সেই বিপুল অন্ধকারের চৌম্বক আকর্ষণ এমন করে টানতে লাগল লেখককে যে, ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠতে গেলেন তিনি। মনে হল, তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আর্ত চিৎকার করে ওঠার আগেই অপ্রতিহত এক আকর্ষণ যেন প্রবল টানে লেখককে সেই অন্ধকারের বুক ভেদ করে মুহূর্তের মধ্যে ভিন্নতর এক জগতে নিয়ে গেল। মুহূর্তকালের জন্য যেন লেখক চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। চেতনা ফিরতেই দেখলেন, ভিন্ন এক জগৎ তাঁর মানসনেত্রের উপর ভাসছে।

বিন্দুর অভ্যন্তরস্থ অন্ধকারের ওপারে বিরাট এক আকাশ। এ আকাশ দিনের আকাশ নয়, এ আকাশ নৈশ আকাশ। নক্ষত্রের ফাঁকে ফাঁকে নৈশ আকাশের অন্ধকার নেই। কোথাও হয়তো তার চাঁদ হাসছে। কিন্তু সে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার ক্ষীণ জ্যোৎস্নার লাবণ্য অন্ধকারের ওপর দিয়ে পাতলা মিহি জ্যোতির্ময় ধোঁয়ার মত প্রবাহিত হয়ে গেছে। ফলে আকাশের নীল পাতলা কোন সিলোফোন কাগজের মোড়কের অন্তরালে নিজের অদ্ভুত স্তিমিত মহিমা ছড়িয়ে দিয়ে দিব্য এক ভাবের সৃষ্টি করেছে। সেই নীলের বুকে অনন্ত অসংখ্য নক্ষত্র যেন রক্তিমাভ হীরকখণ্ডের

মত ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে হাসছে। দেহ নেই। লেখকের বিদেহী চৈতন্য যেন সেই আকাশে একটা নৈশপাখির মত লঘু ডানা মেলে ভাসছে, আর ক্রমশ ঘুরপাক খেয়ে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে অনন্তের অপরিসীম সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হচ্ছে। হেন বিচিত্র দৃশ্য কোথাও থাকতে পারে লেখক যেন চিন্তাও করতে পারছেন না। অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে সমস্ত চেতনার উপর দিয়ে। লেখকের দেহ নেই, আছে শুধু এক চৈতন্যসত্তা। ঐশ্বরিক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে সেই চেতনা শুধু অনন্ত অম্বরের অব্যক্ত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করছে। বেশ কিছুক্ষণ সেই দিব্য আকাশ চোখের উপর ভাসমান থাকার পর আবার অকস্মাৎই তা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। অকস্মাৎ লেখক যেন নিজের জৈব চেতনার মধ্যে ফিরে এলেন। অকস্মাৎই অনুভব করতে পারলেন যে, তার দেহ ডাইনে বাঁয়ে অসম্ভব রকম দুলছে। যেন কোন এক কচ্ছপের পিঠে বসে আছেন তিনি! দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ডাইনে বাঁয়ে দুলছেন। সেই দোলানির মধ্যে অব্যক্ত একটা আনন্দের ছন্দ লুকিয়ে রয়েছে যেন। মানসনেত্রের সামনে তখন বিপুল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিগ্‌বলয়েও একাকী একটিমাত্র নক্ষত্রের মত রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট একটি বিন্দু হাসছে। এই সেই বিন্দু যে বিন্দুর অস্তিত্ব আছে পরিমাপ নেই। শাশ্বত অক্ষয় এক বিন্দু যে বিন্দুর মধ্যেই রহস্যময় অনন্ত জগৎ লুকিয়ে আছে।

চার

বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আশ্চর্য দর্শন লেখককে তখন মুগ্ধ করে রেখেছে। রাত্রি তখন নিত্য অনন্তের অপ্রতিরোধ্য আহ্বান নিয়ে লেখককে ডাকছে। একটি নির্দিষ্ট নৈশ প্রহরের অপেক্ষায় নিত্যই

লেখক যেন ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করছেন। সেই নির্দিষ্ট নির্জন প্রহর আসা মাত্রই লেখক বসে পড়ছেন পদ্মাসনে। অন্ধকার ভেদ করে দুই ভুরুর মাঝ বরাবর সরলরেখায় সুদূর দিগন্তে কখন সেই দিব্য বিন্দু ভেসে উঠবে সেইজন্য অপেক্ষা করছেন। দেহ দুলছে ভয়ানক ভাবে, যেন দেহের কেন্দ্রস্থ কোন অঞ্চল থেকে লুপ্ত একটা শক্তি ঊর্ধ্বদিকে ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে বলেই এই দোলানি। ততক্ষণে অদ্ভুত অদ্ভুত আরও অভিজ্ঞতা হচ্ছে লেখকের জীবনে। ধ্যানের নেশা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সারারাত্রি কেটে যাচ্ছে আকাশ পরিক্রমায়। কিন্তু ভোরবেলা জাগ্রত অবস্থায় জেগে উঠেও দেহে কোন ক্লান্তিবোধ হচ্ছে না। সকালবেলা স্নান সেরে উঠেই আবার বসে পড়তে ইচ্ছা করছে পদ্মাসনে। কিন্তু দিনের বেলায় বসে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। চোখ বুজতেই যেন মনে হচ্ছে লাল একটা ঘন আভা। অন্ধকারের পরিবর্তে ঘন এক লাল আকাশ। সেই রক্তিম আকাশের দিগন্তেও ভ্রূ-মধ্য বরাবর সেই উজ্জ্বল বিন্দু। যেন দিনে রাতে সর্বক্ষণই সে অনন্ত, অক্ষয়। সেই আকাশের মাঝখানে অকস্মাৎ একটি সিঁদুরের টিপের মত ঘন সবুজ টিপ বৃত্ত তৈরি করে ভেসে উঠছে। তারপর আস্তে আস্তে সেই সবুজ বৃত্ত রঙ ছড়াতে ছড়াতে সমস্ত রক্তিম আকাশটাকেই ছেয়ে ফেলছে। এ আকাশ অদ্ভুত এক রঙের আকাশ। জলে ডুব দিয়ে তাকালে যেমন দেখা যায় তেমনই একটা রঙ যেন অনন্ত পরিধি ব্যাপ্ত করে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই রঙের মধ্যে ছায়া ছায়া কত অসংখ্য জীব যেন পদচারণা করে বেড়াচ্ছে। কারা, কি ধরনের জীব বোঝা যাচ্ছে না। অথচ বোঝা যাচ্ছে অফুরন্ত প্রাণের ছড়াছড়ি সেখানে। এরই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ একটি ছবি দেখে চমকে উঠলেন লেখক। ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিত, ক্ষীণকটি, বিস্তৃত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু এক যোগী তাঁর সামনে বসে আছেন। তাঁর মাথায়

ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ঢেউতোলা কেশগুচ্ছ। উদ্বৃত্ত কেশগুচ্ছ তাকে কঠিন বন্ধনে বেঁধে কাঁধ বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। সেই কঠিন বন্ধন ঘিরে জড়িয়ে আছে একটি ফণাধর সাপ। যেন পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ জটাজাল। এক পাশে মৃত্তিকায় প্রোথিত ত্রিশূল। ত্রিশূলের অব্যবহিত নিম্নাংশে বাঁধা রয়েছে ডম্বরু। আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেই যোগী লেখককে আশীর্বাদ করছেন। যেন স্বয়ং শিব লেখককে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। জ্যোতির্ময় ধূম্রপুঞ্জ দিয়ে গড়া অপূর্ব এক দৈবীদেহ। এ যে কোন কল্পনা, এমনও মনে হয় না, মনে হয় সত্য। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতেই দেখা যায়—কিছু নেই। অথচ চোখ বুজলে আবার সেই মূর্তি। লেখকের অবচেতন মন যেন তখন ধ্যানের মধ্যেই বিশ্লেষণ করতে বসে যায়ঃ—একি তাঁর পুরাণ পাঠজনিত মনের প্রক্ষেপ? নিদ্রায় স্বপ্নরূপে যা দেখা যায় একি তাই! নিদ্রায় সচেতন মনের দুয়ার খুলে নানা আবদ্ধ জিনিস এমনি সব অদ্ভুত রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে। ধ্যানে সচেতন মনের ক্রিয়া বন্ধ হতেই কি এমন হচ্ছে? একথা ভাবতে ভাবতে যখন তিনি আবার সেই বিন্দু লক্ষ্য করে তলিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি দৃশ্য দেখে তিনি চমকে গেলেন—যেন সামনে ঝিকিমিকি করে হাসছে তুষারমৌলী হিমালয়ের শৃঙ্গ। চূড়ায় চূড়ায় জড়িয়ে থাকা শ্বেতশুভ্র বরফ ছাড়া আর কিছুই

ধ্যানে দৃষ্ট শিব মূর্তি

নেই। যেন উজ্জ্বল শুভ্র কোন রত্নের মত সেই তুষারমণি আলো বিকিরণ করছে। কোন এক শৈল শিখরের পাশ দিয়ে হাত গলিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে রোমশ এক প্রাণী, যে ইয়াতির কথা তিব্বত ও নেপালে শোনা যায় ঠিক যেন সেই ইয়াতির মতন। চোখের পলকে সেই ইয়াতিটিকে জীবন্ত অবস্থায় নড়তে দেখে লেখক চমকে
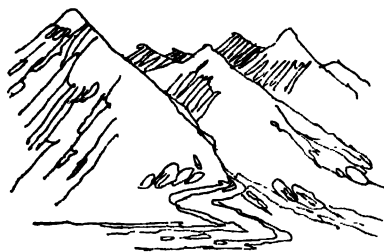
ধ্যানে দৃষ্ট শৈলশিখর

চিৎকার করে উঠতে যাবেন—হঠাৎ সেই দৃশ্য হারিয়ে গিয়ে ছায়া ছায়া সবুজের বুকে জ্বলতে লাগল সেই ধ্রুব বিন্দু। এ কি দেখছেন! লেখকের যেন বিস্ময়ের কোন অন্ত থাকল না। প্রকৃত-পক্ষে বিচিত্র মনের এ আর একটি খেলা বলেই লেখক ধরে নিলেন। অথচ কী নেশা! অন্তর্জগতের ব্যাখ্যাতীত রহস্যময় এই খেলা দেখে যেন তিনি বিভ্রান্ত অথচ অদ্ভুত এক সম্মোহে আচ্ছন্ন। সারারাত কেটে যাচ্ছে চোখ বুজে। দিনের অধিকাংশ প্রহরও তখন কেটে যাচ্ছে নিমীলিত নয়নে। কি আছে ক্ষুদ্র একটি দেহের মধ্যে কে জানে! সবই অবিশ্বাস্য, অথচ অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণে ভরা। যা কিছু দেখছেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, অথচ সেই ভ্রান্তিকে দেখার নেশাও তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না।

মানসনেত্রে তখন রীতিমত ছবির খেলা চলছে। যেন সিনেমার রিল ভেসে যাচ্ছে কোন এক অদৃশ্য পর্দার ওপর দিয়ে। মহা-শূন্যতার অন্ধকার তখন উধাও। রাতে চোখ বুজলে সামনে ভাসছে আকাশ, দিনে চোখ বুজলে সামনে ভেসে উঠছে স্তরে স্তরে রঙ। ততদিনে সবুজ ছায়া ছায়া রঙের আকাশ পার হয়ে মানসনেত্রে ভেসে উঠছে নিদাঘদগ্ধ এক আকাশের ব্যঞ্জনা। এরই মধ্যে আর একদিন আর একটি দৃশ্য দেখে লেখক স্থির সংকল্প

নিলেন যে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এ দেখা সত্য কিনা। দেখলেন, অকস্মাৎ তীব্র আলোর ঝলক চোখের উপর দিয়ে খেলে গেল। তারপর প্রত্যক্ষ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল সব। লেখক দেখলেন তাঁর দুই পরিচিত আত্মীয়া কালীঘাটে মন্দির দালানের সামনে যূপকাষ্ঠের কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি সচেতনভাবে সেই দৃশ্য এবং সময় তার ডায়েরীতে টুকে রাখলেন। পরীক্ষা করে দেখতে হবে এ দৃশ্য সত্য কিনা! সেই দিনই খবর নিয়ে লেখক দেখলেন, যা দেখেছেন, তা সত্য। সেই দিন, সেই মুহূর্তে তাঁরা দু'জন সত্যি সত্যিই ফাঁড়া কাটানোর উদ্দেশ্যে সেই যূপকাষ্ঠের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাহলে! এ দেখা যদি মিথ্যে না হয় অন্য দেখাই বা মিথ্যে হবে কেন?

তাহলে যে শিবকে তিনি ধ্যানরত অবস্থায় আশীর্বাদ দানের ভঙ্গীতে তাঁর মানসনেত্রে দেখেছেন, সে শিব কি সত্যি? শৈবরা তো এই শিবকেই বলেন ভগবান। আবার ভারতীয় শাস্ত্রে ভগবানকে বলা হয়েছে নির্গুণ নিরাকার। তাহলে এ রূপে শিব সত্য হতে পারেন কি করে? তবে কি এ শিব যথার্থই কোন কোন যোগী? এইভাবে ধ্যান করার সাধনপথ কি তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন? শোনা যায় যোগীরা ধ্যানে কুলকুণ্ডলিকে জাগ্রত করে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। তাঁরা ইচ্ছা-মাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটাতে পারতেন। এই যে ইচ্ছাশক্তি বা এনার্জি এরই নাম 'ভগ'—শাস্ত্রে যাকে 'যোনি' নাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অফুরন্ত শক্তির যিনি অধীশ্বর হন, সেইজন্য তিনি ভগবান নামে চিহ্নিত হন। লোকে তাঁকেও ভগবানরূপে পুজো করে। কোন কোন যোগী একই দেহে ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল পেয়ে থাকেন। শোনা যায় বাবাজী মহারাজ নামে মহা এক যোগী হিমালয়ে প্রলয়কাল পর্যন্ত অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুধু অনন্ত জীবন নয়, অনন্ত যৌবনেরও তিনি

অধিকারী। কিন্তু ঐযে লেখক হিমালয়ের দৃশ্য দেখলেন, সেটা তবে কি? তিনি তো জীবনে কখনও হিমালয়ে যান নি? তুষারধবল হিমগিরি শৃঙ্গের সঙ্গে কখনও তাঁর পরিচয় হয়নি? তবে সে দৃশ্য তিনি দেখলেন কি করে? এটা কি তাহলে তার মানস প্রতিফলন? কোন ছবি দেখার প্রভাব? বা সিনেমা দেখার প্রভাব? তাহলে দেখার মধ্যে কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা মিশ্রিত থাকে? অর্ধেক সত্য, অর্ধেক কল্পনা মিশিয়েই কি জগৎ?

লেখক যখন এমনিতরভাবে বিভ্রান্ত, ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত লোকের সঙ্গে তার দেখা। সে লোক সাধুও নয়, সন্ন্যাসীও নয়। রীতিমত ধুতি চাদর পরা ফুলবাবু, চেন-স্মোকার। ক্লান্ত লেখক কোনদিন এক রেস্টুরেণ্টে বসে খাচ্ছিলেন। সেখানেই সেই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। দেখে 'অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী' এমন ভাববার কোন কারণই নেই। দু' একজন সাধককে লেখক দেখেছেন, যাদের চোখে বিদ্যুৎ চমকের মত দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের চশমাপরা চোখে তেমন কোন দৃষ্টি নেই। আবার সে-চোখ নিষ্প্রভও নয়। একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের চোখ যেরকম হয়ে থাকে সেইরকম। দেহ পেটা গড়নের। রঙ ফর্সা। রঙের উপর এটা উজ্জ্বলদ্যুতি আছে, যা প্রাণ-শক্তির প্রকাশক। রেস্টুরেণ্টে আর কোন লোকই প্রায় ছিল না। সব টেবিলই প্রায় ফাঁকা থাকতেও তিনি লেখকের টেবিলে এসেই বসলেন। বললেন,

—এখানে বসলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

লেখক বললেন, না। বসুন।

আগন্তুকের প্রথম প্রশ্নই হল, আপনি কি করেন?

—অধ্যাপনা।

—আমি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সুপারিনটেনডেন্ট।

লেখক তাঁর বেশভূষা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে বললেন, এ বেশে!

ভদ্রলোক স্মিত হাসি হেসে বললেন, জাতীয় পোশাক। অবশ্য ঠিক জাতীয় কিনা, তাই বা কে জানে! বলতে পারেন বাঙালীর পোশাক। আজ বিকেলে আমার অবসরের সময়। তাই বাঙালীর পোশাকেই বেরিয়েছি। আপনার বিষয় কি?

লেখক বললেন, ইতিহাস।

—কিন্তু আপনার চোখে যে রয়েছে দর্শনের চিহ্ন।

—মানে!

—এ চোখে যে অনেক কিছু দর্শন হয় মশাই!

—অর্থাৎ?

—এই ধরুন 'বিন্দু'।

লেখকের যেন বিস্ময়ের সীমা থাকল না। তিনি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

একটি ডাবল ডিমের ওমলেট অর্ডার দিয়ে ভদ্রলোক লেখকের দিকে তাকালেন ঃ এত দ্বিধায় ভুগছেন কেন?

—দ্বিধা?

—হ্যাঁ।

—কিসের দ্বিধা?

—এই যে এত সব দেখছেন, অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না?

—আপনি!...

—আমি অতি সামান্য লোক। কিন্তু আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছি। ব্ল্যাকহোল পার হতে পারে পৃথিবীতে দু' একটা লোকই। এসময় অনেকেই মারা যায়। আপনি তো দেখছি দিব্যি বেরিয়ে গেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অনেক জিনিস আছে মশাই, যন্ত্রবিজ্ঞানে যা ধরা পড়ে না, অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে। আরে মশাই, লোকে কি বোকা দেখুন। যন্ত্রকে নিজের চাইতে বড় করে দেখে। যন্ত্র যদি ব'লে না দেয় বিশ্বাস করতে চায় না। যন্ত্রে হাতেনাতে

ধরতে পারলে তবে বিশ্বাস। অথচ এই বোকারা একথাটা ভাবতে পারে না যে, মানুষ যন্ত্রের চাইতে বড়। কারণ, মানুষই যন্ত্র তৈরি করেছে, যন্ত্র মানুষ তৈরি করেনি। যে যন্ত্র তাকে সৃষ্টি করে নি, সেই যন্ত্রে ধরা না গেলে চৈতন্যলব্ধ কথায় মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। অনেক মূর্খ পণ্ডিত আছেন, কোন নতুন কথা বললেই দেখবেন জিজ্ঞাসা করবেন, কোন্ বইয়ে পড়েছেন ? আরে, প্রথম যে লোকটা লিখেছিল বা বলেছিল, সে কোন্ বই দেখে লিখেছিল বা বলেছিল, বলুন ?

আশ্চর্য আর্গুমেণ্টের ক্ষমতা লোকটির, শুনলে সত্যিই মাথায় ভাবনার উদয় হয়। লোকটির অকাল্ট পাওয়ার বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাও অসীম। কি করে লেখকের একান্ত গোপন মনের কথা এমন করে বলে যেতে পারলেন !

কথা বলতে বলতেই ডাবল ডিমের ওমলেটটা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন লোকটি। মুহূর্তের মধ্যে চায়ের কাপটি শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর রেস্টুরেণ্টের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে নির্বিকারে চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, যা করছেন, করে যান। অনেক কিছু জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। নিজের জবাব নিজের কাছেই পাবেন। এ জন্য আর পরের দুয়ারে ঘুরতে হবে না। ভদ্রলোক চলে গেলেন। লেখক দিশেহারা অবস্থায় বসে নিজের মনের মধ্যে শুধু অবাকই হতে লাগলেন। জগতে বিস্মিত হবার মত ঘটনার অন্ত নেই।

ভদ্রলোক কে, কোথা থেকে এসেছিলেন, কে জানে! তাঁর যথার্থ কোন সত্তা আছে বা নেই, তাই বা কে বলবে! কিন্তু লেখককে তিনি যে একটি বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে গেলেন তা হল এই যে, তিনি যে পথ অনুসরণ করছেন, তা মিথ্যে নয়, সত্যি। যা দেখছেন তাও মিথ্যে নয়, সত্য। সুতরাং দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে

লেখক তাঁর অন্তর্দর্শনের ধারা অনুসরণ করে যাবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হলেন।

সাধনা চলতে লাগল তখন দিনে এবং রাতে সব সময়। জীবিকার জন্য কর্ম শেষে যে সময়টুকু মেলে লেখক তার সবটিই ব্যয় করতে লাগলেন আপন মন্ময়তায়। দিনে তখন রৌদ্রদগ্ধ সাদা মেঘের মৌজের ফাঁকে বায়ুমণ্ডলের নীল উঁকি দিচ্ছে। বহুদূর অনন্ত অম্বর থেকে এক অপ্রতিরোধ্য আহ্বান আসছে। লেখকের মনে হচ্ছে, তাঁর একটা সূক্ষ্মসত্তা পাখির মত আকাশের ঊর্ধ্বদিকে উঠছে তো উঠছেই। রাতের ধ্যানেও নক্ষত্রমণ্ডলের ফাঁক দিয়ে নিষ্কলঙ্ক নীল যেন আপন সচ্ছতায় ফুটে উঠছে। কখনও কখনও জ্যোতির্ময় মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেই নীল আকাশের বুক ধরে ধরে। কোথা থেকে অদ্ভুত এক দৈব জ্যোতি এসে যেন সেই ভাসমান মেঘের পাখায় পড়ে তাঁকে অতীন্দ্রিয় রহস্যে ভরে তুলছে। শোনা যাচ্ছে না, তবু বোধ হচ্ছে, কোন্ সুদূর অনন্ত লোক থেকে গম্ভীর এক ধ্বনি যেন ভেসে আসছে। কোথায় যেন কে আছে, তাঁকে ধরা যাচ্ছে না, অথচ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহও হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে আসনে বসে যে কম্পন অনুভব করা যাচ্ছিল তা ঝড়ের মত তীব্র হয়ে থেমে গেছে। ভিন্নতর এক স্বাদ অনুভূত হচ্ছে দেহের মধ্যে। হরিজোণ্টাল কম্পন থেমে গিয়ে ভার্টিকাল আকর্ষণ বোধ হচ্ছে। দেহটা ক্রমশ হাল্কা হয়ে উঠছে। যেন মৃত্তিকা ছেড়ে ঊর্ধ্বে তোলার জন্য কে তাকে টানছে। আর মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড রকমে কেঁপে উঠছে সমস্ত শরীর। যেন কিছু একটা শরীর বেয়ে ঊর্ধ্বে ওঠার সময় কোথাও প্রতিহত হয়ে সেই বাধা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আর তারই ফলে দেহটা ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আসনের যে তিনটি পর্যায় আছে বলে লেখক শুনেছেন, একি তারই কোন পর্যায়?

শাস্ত্রে আসনের আছে তিনটি পর্যায়—ঘর্ম, কম্পন ও ভূমিত্যাগ। লেখকের অপরিসীম সৌভাগ্য ঘর্ম পর্যায় তার কখনই হয়নি। অর্থাৎ আসনে বসে মন অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করেনি। একদিন মাত্র বসতেই অলৌকিক এক বিন্দু বিচিত্র রহস্য সৃষ্টি করে সেই যে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তার ফলে গল্প পাঠের আকর্ষণের মত এমন এক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি যে, সেই আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে মুগ্ধচিত্ত হরিণের মত ছুটে গিয়েছেন। মানস-নেত্রে বিচিত্র দৃশ্য দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছেন যে, মনের মধ্যে অস্থিরতা বোধের অবকাশ পাননি। বস্তুত তাঁর ধ্যান আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই, অর্থাৎ কম্পন পর্যায় থেকে। আসনে বসার কিছুদিন পর থেকেই তাঁর দেহ দুলতে আরম্ভ করেছিল। ঐ দোলন ছিল হরিজোণ্টাল। এখন তা ভার্টিকাল হয়ে ভিন্নতর কম্পন সৃষ্টি করেছে। যেন কোন কিছুর ধাক্কা খেয়ে সারা শরীর কেঁপে উঠছে, আর সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে দেহটা ঊর্ধ্বে কোথাও উঠে যাবে।

৺ধ্যানে দৃষ্ট কালীমূর্তি

এখন দিনে হচ্ছে রঙ ও দৃশ্য। রাতে মূলত দৃশ্য ও ধ্বনি। দিনের অভিজ্ঞতা প্রায়ই সীমিত থাকছে পার্থিব ঘটনাবলীর মধ্যে। রাতের অভিজ্ঞতায় ফুটে উঠছে অতীন্দ্রিয় জগৎ। দু'দিন দিনের বেলায় ধ্যান করতে করতে লেখক দেখতে পেলেন অদ্ভুত দুটি দৃশ্য—দুটি ৺কালীমূর্তি, পুজো হচ্ছে। স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছেন, যেন কাছে থেকে। ধূপদানি থেকে ধোঁয়া উঠছে, তা পর্যন্ত নজরে পড়ছে। এমনকি নাকে গন্ধও আসছে। ছবি দুটি এমন জীবন্ত যে, ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সাড়া জাগিয়ে বাস্তব চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলছে। লেখক বুঝতে পারলেন না, কোথায় এ পুজো দুটি হচ্ছে! কেনই বা তিনি দেখলেন! পরে অবশ্য এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান হয়েছিল ওয়েভলেংথ তত্ত্বের ভিত্তিতে—যে কথা 'দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা' গ্রন্থ প্রথম খণ্ডে লেখক ব্যক্ত করেছেন। অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানও এ তত্ত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু সে সব তত্ত্বের কথা থাক। ধ্যানকালে লেখকের যে সব দর্শন হয়েছিল এবার সে-কথাই বলা যাক।

রাতের ধ্যানে যে-চোখ দেখছিলেন তা তখন সরে গেছে। একটা স্বচ্ছ দেশীয় (spatial) দর্পণের প্রান্তদেশ থেকে লেখকের যে ছায়া পড়ছিল তাও ঘুরে ঘুরে মুখোমুখি হয়ে সেই যে সরে গেছে, সে দৃশ্যও তার চোখের উপর আর কখনও ভেসে ওঠেনি। এখন নৈশ আকাশেও যেন রঙ ফুটতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-একটা ছবি ভেসে যাচ্ছে যা স্পষ্টত পার্থিব। তবে ভারতীয় নয় ভিন্ন দেশীয়, মুখ্যত ইউরোপীয় বা আমেরিকান। কেন এমন ঘটছে, কিসের জন্য, লেখক বুঝতে পারছেন না। মাঝে মাঝে আকাশের কোন কোন অংশ থেকে যেন সার্চ লাইট ফেলার মত আলো আসছে। কেন আসছে লেখক তা বুঝতে পারছেন না। পরে বুঝেছেন যে, এ আলো দিব্যজগতের আলো। দিব্যজগতের অনন্ত জ্যোতি দেহে ধারণ করতে হলে দেহের প্রতিটি কোষকে তদনুযায়ী তৈরী করা না গেলে—সেই দিব্যশক্তি দেহ ধারণ করতে পারবে না। যেমন, চল্লিশ ওয়াট ধারণ ক্ষমতার বাল্‌বে একশ ওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ ঠেলে দেওয়া যাবে না। তাহলে সে বাল্‌ব ফেটে যাবে।

দিনে ধ্যানে বসলে মানসনেত্রে এখন সাদা মেঘের ফাঁকে স্পষ্ট

ফুটে উঠছে নীল রঙ। যেন বাচ্চা ময়ূরের কণ্ঠে স্ফুটমান নীল রঙ স্পষ্ট বর্ণ নিয়ে ফুটে উঠছে। হঠাৎ এরই মধ্যে অকস্মাৎ একটি চিত্র দেখে রীতিমত বিস্ময়াভিভূত হলেন লেখক। স্পষ্ট তিনি দেখতে পেলেন, মহাশূন্যে একটি শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে আছে একটি সাপ। জড়িয়ে ধরে আছে তিনটি প্যাঁচে। বাকি অংশ বিরাট ফণা তুলে হেলছে দুলছে। কিছুকাল এই দৃশ্য দেখার পর ক্রমশ নিবিড় হয়ে ফুটে ওঠা নীলের মধ্যে তা যেন হারিয়ে গেল। তখন প্রায় মেঘমুক্ত নীল আকাশ ছড়িয়ে পড়েছে।
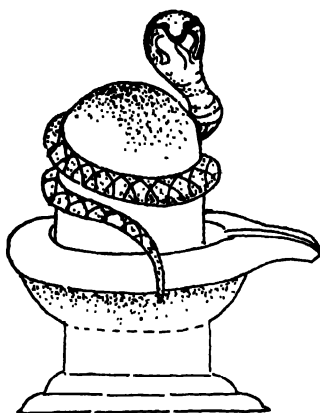
ধ্যানে দৃষ্ট সর্পবেষ্টিত শিবলিঙ্গ

আশ্চর্য! একটা মানুষ চোখ বুজলে নিজেরই অভ্যন্তরে এমন সব দৃশ্য দেখতে পায়, লেখকের আগে কখনও তেমন ধারণা ছিল না। এ এক অদ্ভুত উপভোগ্য ব্যাপার যেন। যেন একটা মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বজগতে যত রঙ আছে তার সব কয়টি রঙ। মানুষ যেন একটি রঙের বাক্স।

নীল নীলতর হচ্ছে। নীলের বুকে কোথা থেকে কিছু কিছু কালো ছায়া পড়তে আরম্ভ করেছে যেন। যেন কয়েকটা পাখি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারি মধ্যে ফুটে উঠছে হয়তো একটা আধটা মানুষের চিত্র। যে চিত্র আগে ছিল সিনেমার পর্দায় দেখা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট চিত্রের মত সেই চিত্রই যেন এখন তার স্বকীয় রঙ নিয়ে নির্ভেজাল আকৃতিতে ফুটে উঠছে।

রাতের আকাশে কিন্তু তখনও জ্যোতির্ময় আলোয় লেপা

নীলের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু কিছু দিব্য মেঘ। ফাঁকে ফাঁকে বহুদূর-গগনের নক্ষত্রেরা উঁকি দিচ্ছে। দিনে রাতে সব সময়ই যেন ঘূরপাক খাওয়া একটা পাখির মত চেতনা কেবল ঊর্ধ্বদিকে উঠছে তো উঠছেই। একদিন রাতে পাখার হাওয়ার নিচে লেখক যখন সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছেন ঠিক তক্ষুনি কেন যেন তাঁর নাভিদেশ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল—'ওঁ'। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মহা অম্বর যেন একটি বিশাল গুহাবিশেষ, সেখানে সেই 'ওঁ' শব্দটি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—অ-উ-ম, অ-উ-ম, অ-উম…।

লেখকের প্রতি শিরায় উপশিরায়, রক্তকণিকায় যেন অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে সেই প্রতিধ্বনি অব্যক্ত এক রোমাঞ্চ তুলতে লাগল। চকিত বিস্ময়ে মুগ্ধ লেখক বার বার ধ্বনি তুলতে লাগলেন—'ওঁ', ওঁ। বার বার তা মহাবিশ্বের বুকে যেন গুহা-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অ-উ-ম, অ-উম, অ-উ-ম। মহাবিশ্ব-জগতের উৎপত্তির প্রথম থেকেই সেই ধ্বনি যেন চলছে তো চলছেই। প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধ্বনি ধ্বনিত হতেই থাকবে। যার সূক্ষ্ম শ্রুতি আছে সেই তা শুনতে পাবে আর কেউ নয়। অর্থাৎ স্থূল চেতনাকে অন্তত সূক্ষ্ম জগতের অর্ধস্তর পর্যন্ত ওঠানো না গেলে এ শব্দ শোনা যাবে না। এই জন্যই কি শাস্ত্র-কারেরা মধ্যমা শব্দের কল্পনা করেছিলেন? এই আদি প্রণবই মহাবিশ্বের প্রাণসত্তা। এই ধ্বনির স্পন্দনেই ছন্দায়িত জগৎ ফুটে উঠেছে। যে সেই ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে সে-ইই জগতের আনন্দের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারবে।

বেশ কয়েকদিন ধরে চলল 'ওঁ' ধ্বনির আনন্দে তরঙ্গায়িত হওয়া। অকস্মাৎ এরই মধ্যে লেখক একদিন—অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে চমকে গেলেন। একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা মহাকাশের এককোণে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তারই মধ্যে একটি ছায়া

মূর্তি। কার এই ছায়ামূর্তি? লেখক আশ্চর্য হয়ে একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলেন স্বামী বিবেকানন্দের। ঠিক তার পরই আরও অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি চমকে গেলেন। দুই ভুরুর মাঝ বরাবর যেন মূর্তিকার খুব কাছেই পাশাপাশি বসা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মা সারদামণি। কি দেখছেন লেখক! এ কি মনের ভ্রম! মানুষের চিন্তার প্রতিফলন? ধ্যানের মধ্যেই লেখক নিজের অন্তর বিচার করে দেখলেন, না,—এদের সম্পর্কে তিনি কখনই তেমন চিন্তা করেন নি। শুধু এদের সম্পর্কে কেন,—কোন সাধুসন্ত সম্পর্কেই তাঁর মনে কখনও তেমন চিন্তা ছিল না। বরং তিনি ছিলেন রোমাণ্টিক চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন,—নাম যশের প্রতি ধাবমান। তাহলে এ চিত্র তিনি দেখছেন কেন? সত্যি সত্যিই কি মানুষ নিজের মনের যথার্থ চিন্তা সম্পর্কে জানতে পারে না? সচেতন চিন্তার বাইরে অবচেতন মনের চিন্তাই বেশি সক্রিয়? সেই সব চিন্তাই নীরব মুহূর্তে মনের বন্ধ-দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে? এ জন্মে তো তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সারদামণি সম্পর্কে তেমন চিন্তা করেননি, বিবেকানন্দ সম্পর্কেও নয়। তাছাড়া এসব দেখছেনই বা কেমন করে? তাহলে কি মানুষের স্থূল দেহের বাইরে সূক্ষ্ম একটি সত্তা আছে—যাকেই জীবাত্মা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে? তাঁদের দেখার কারণ কি তাহলে এই যে, পূর্ব জন্মে এই সব পুণ্যাত্মাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি?
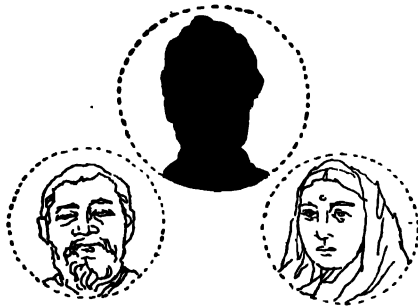
ধ্যানে দৃষ্ট বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি

লেখক ভেবে যেন কোন কূলকিনারা পেলেন না। আস্তে

আস্তে সেই সব মূর্তি চোখের উপর থেকে হারিয়ে গেল। নীলের বুকে বহুদূরে আবার ফুটে উঠল সেই হীরকসদৃশ বিন্দু। লেখক সেই দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চেতনা যেন ধীরে ধীরে আবার ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

লেখক যতই চেতনাকে ঊর্ধ্বদিকে ওঠাতে লাগলেন ততই যেন নীলের গভীরতা বাড়তে লাগল। কখনও সেই নীলের বুকে অকস্মাৎ অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র রাত্রির আকাশের মত ভেসে ওঠে, আবার কখনও তা ডুবে যায়। নীল ক্রমশ গভীরতর হতে থাকে।

নীল যেন গভীরতর হচ্ছে অদ্ভুতভাবে। লেখকের মনে হচ্ছে ট্যাক্সির কাচের সামনে বৃষ্টির জলমোছা হ্যাণ্ডেলের মত কোন একটা জিনিস নীল কেটে কেটে গভীরতর আর এক নীলের জগতে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে, কখনও কখনও সেই নীল এত গভীরতর হচ্ছে, যেন কোন কিংবদন্তীর দেশের বা মেরুপ্রদেশের কোন রহস্যময় হ্রদের মত মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড অতলান্ত গভীর হ্রদ। সেই সুগভীর নীলের বুকে ঘন মেঘের মত প্রান্তদেশ থেকে কালো ছায়া পড়ছে। মনে হচ্ছে, কোন অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গের ছায়া। যেন কোথায় কোন মেরু ভালুকের গল্প শুনেছিলেন তিনি যার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কোন্ পুরাণ কাহিনীতে যে সে গল্প আছে লেখক মনে করতে পারেন না। কে জানে, কত জন্মের স্মৃতি চেতনার অতল তল থেকে উঠে আসছে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব তো প্রমাণ করেছে যে, আদিম প্রাণ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা কোন জিনের মধ্যে বহু সুদূর অতীতের স্মৃতিও থাকতে পারে, এবং সেই স্মৃতি স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়ে স্বপ্ন দর্শনরত ব্যক্তিকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিতে পারে। প্রাচীন 'মিথ্' তার মধ্যে ব্যাখ্যাতীত এক শিহরণ জাগাতে পারে।

দিনের পর দিন গভীরতর নীলের জগতে ডুবে যাচ্ছেন লেখক।

অকস্মাৎ একদিন সেই নীলের বুকে আর একটি দৃশ্য তাঁকে চমকিত করে দিল যেন। সন্ধ্যাতারার মত ফুটে ওঠা সেই বিন্দু অকস্মাৎ যেন বিস্ফোরিত হয়ে অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল চারদিকে। তাহলে কি এমনি কোন নীলের বুকেই বিস্ফোরণ ঘটে জগৎ তৈরি হয়েছিল? আর গভীরতর এই নীলের বুকে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই কি পালনকর্তা ঈশবর বা বিষ্ণুর রঙ নীল? কারণ, নীলের বুকে কোন অজ্ঞাত অন্ধকার থেকে ফুটে উঠে এই বিস্ফোরণজাত স্ফুলিঙ্গগুলি নীলের বুকেই স্থিত হয়ে থাকে। সেই অন্ধকারই হয়তো 'ব্রহ্মণ-মানস', ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। নীল বর্ণের বিষ্ণু (তামিল 'বিন্' বা আকাশ শব্দ থেকে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি, যে আকাশ দেখতে নীল, Vide, O. D. B. L.) এই জগৎ সৃষ্টি করে পালন করছেন। সে কথা গভীর মানসে চিন্তা করতে করতেই লেখক আর একটি দৃশ্য দেখে রীতিমত বিস্ময়াভিভূত হলেন। দেখলেন, সেই বিন্দু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এবং তার ফাঁক হয়ে আসা মধ্যস্থলে একটি অন্ধকার ঢিবি তৈরী করছে। যেন শিবলিঙ্গের মত। লিঙ্গাকৃতি সেই অন্ধকারকে মধ্যস্থলে ধারণ করে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে আরম্ভ করেছে বিন্দুটি। যেন স্পষ্ট একটি শিবলিঙ্গ। তাহলে কি বিন্দুর এই অবস্থা লক্ষ্য করেই সাধকেরা শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টের কল্পনা করেছিলেন?

লেখক অবাক হয়ে দেখলেন, লিঙ্গাকৃতি সেই অন্ধকারের পাশের জ্যোতির্বলয়টি প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে ঘুরতে ডিম্বাকৃতি হয়ে গেল। সেই অন্ধকারই যেন বিন্দুর অক্ষরেখা—যার চারপাশে ঘূর্ণায়মান হতে গিয়ে জ্যোতির্বলয়টি ডিম্বাকৃতি (Oval) হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই কি মহাশূন্যতা (ব্রহ্ম) থেকে উদ্ভূত শক্তিরূপী জগৎকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করেছিলেন ভারতীয় যোগীরা? (অবশ্য ১৯৬৫ সালে নিউ জার্সির বেল লেবরেটারিতে প্রমাণ

হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ড গোলাকৃতি।) লেখকের বিস্ময়ের যেন অন্ত থাকল না। আপন অন্তরের গভীর গহনে ডুব দিলে কতনা অজ্ঞাত রহস্যের যথার্থ অর্থ ধরা যায় !

মহাকাশে স্তরে স্তরে কত রঙ, কত আশ্চর্য দৃশ্য ! লেখক যখন দেখে দেখে অবাক হচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকদিন আরও অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি যেন হতবাক হলেন। কোথা থেকে যেন জ্যোতির্বলয়ে অঙ্কিত হয়ে একের পর এক কতকগুলি ধ্যানরত মূর্তি ভেসে আসছে। পরে এই সব মূর্তির রহস্য ভেদ করে দিয়েছিলেন আর একজন ভদ্রলোক সাধক। মানুষের অন্তর্দর্শন যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়ে যায়। লেখককে দেখে বললেন, প্রচণ্ড ধ্যান করেন দেখছি ? লেখকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর কোন এক জ্যোতিষীর বৈঠকখানায়। লেখক আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, কোথায় আর করি। একটু আধটু বসি, এই আর কি ?

ধ্যানে দৃষ্ট যোগীমূর্তি

—অনেক কিছুই দেখছেন। কি কি দেখেছেন বলুন শুনি ?

লেখক প্রথমটা হতচকিত হয়ে গিয়ে কোন জবাব দিতে পারেন নি। পরে সেই গোপন অভিজ্ঞতাগুলির কথা তাঁকে বলে যেতে থাকেন। প্রথম দিন ধ্যানে বসা থেকে গভীর নীল আকাশে প্রবেশ করা পর্যন্ত নানা দর্শনের কথা তিনি তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন। শুধুমাত্র যোগাসনে বসা ধ্যানরত মূর্তিগুলির কথা বলতে ভুলে যান।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, আর কি দেখেন তাই বলুন ?

লেখক বলেন, আর কি দেখব ? যা দেখেছি সবই তো বললুম।

—আর কিছু দেখেন না ?

—আর কি ?

—কিছুই না ?

—আর দেখি আলোর রেখায় আঁকা কিছু কিছু যোগী মূর্তি।

—সে-কথাই বলুন। আমি তো ভেবে অবাক হচ্ছি আপনাকে এত কিছু শেখাচ্ছে কে ?—

—অর্থাৎ ?

—এই যে যোগী মূর্তি দেখছেন, এঁরাই সূক্ষ্মদেহে আপনাকে যোগের নানা দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন।

—কিন্তু আমি তো ঠিক এঁদের তেমন করে···

—চিনতে পারেন না, এই তো ?

—হ্যাঁ।

—আস্তে আস্তে স্পষ্টভাবে এঁদের দেখতে পাবেন। মনে রাখবেন, এঁরাই আপনার যোগশিক্ষাদাতা। সত্যিই আপনি সৌভাগ্যবান।

কে জানে, লেখক সৌভাগ্যবান কি নন। তবে অন্তর্জগতের এই গভীর রহস্য তাঁকে যে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করছে সন্দেহ নেই। যখনই এতটুকু অবসর পান, তখনই চোখ বুজে অন্তরের আকাশে অসংখ্য রহস্যময় চিত্র দেখতে বসে যান তিনি। পার্থিব দৃশ্য দৃশ্যান্তর যেন এই নতুন অভিজ্ঞতার কাছে কিছুই নয়।

সত্যি, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবার অল্প কিছুদিন পরেই লেখক দেখতে পেলেন যে, সেই যোগী মূর্তিগুলো যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। ইতিমধ্যে লেখক দুই ভুরুর মাঝখানে প্রচণ্ড

একটা শক্তির আকর্ষণ অনুভব করছেন। ঠিক যেখানটায় আছে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সেইখানটাই কে যেন প্রচণ্ড একটি চুম্বক দিয়ে কপালের কোষগুলিকে টানছে। আর সেই টানের বেগে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের অঞ্চলটি যেন ফেটে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমনি দিনে একদিন অকস্মাৎ মনে হল, যেন কোন কিছুর বিস্ফোরণ ঘটে গেছে সেখানে। লাল, সবুজ, সাদা, হলুদ, বেগুনী, নীল, কত অসংখ্য রঙ যেন কোন এক গোপন রঙের বাক্সে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই নতুন অভিজ্ঞতার বিস্ময়ও যেন ব্যাখ্যার অতীত। কয়েকদিন আবার চলল সেই বিস্ফোরণের খেলা। তারপরই আবার যেন সূক্ষ্ম লাল, সবুজ, সাদা পেরিয়ে অদ্ভুত এক জ্যোতির্ময় নীলে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। সেখানে ধ্যানদৃষ্ট সেই যোগীমূর্তিগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। একের পর এক লেখক যেন তাঁদের চিনতে লাগলেন। প্রথম একদিন একটি মূর্তি দেখে লেখক বুঝতে পারলেন—ইনি তৈলঙ্গস্বামী। এবার আস্তে আস্তে আরও কত অসংখ্য! আশ্চর্য! নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন ঋষি অরবিন্দকে। দেখলেন, রবীন্দ্রনাথও সেখানে নিমীলিত নেত্রে যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

লেখক নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক শিহরণ বোধ করলেন। তাহলে এঁরা কেউ মরেন নি? শুধু দেহের রূপান্তর ঘটিয়েছেন মাত্র! এই জন্যই কি আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, আত্মা অমর? তাহলে সমাধি হলে কি হয়?—নির্গুণে লয় প্রাপ্ত হয় বলে শোনা যায়। সেটা কি মৃত্যু নয়? না সেই নির্গুণত্বই অনন্ত জীবন যে জন্য নির্গুণ থেকে উদ্ভূত সকল আত্মাকেই অমৃতের পুত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে? স্থূলদেহ ছাড়িয়ে গেলে তাঁরা সূক্ষ্মদেহে থাকেন? সূক্ষ্মদেহ মিশে গেলে নির্গুণে অমর প্রাণসত্তার সঙ্গে মিলিত হন? তাহলে তৈলঙ্গস্বামী,

প্রভৃতি যে সাধক, এঁরা সকলেই তো সমাধিস্থ হয়েছিলেন ? তবু এঁদের সূক্ষ্মদেহ ষষ্ঠতল ও সপ্ততলের মাঝখানে ভাসমান দেখা যাচ্ছে কেন ? তাহলে কি স্বেচ্ছায় এঁরা এখানে অবস্থান করছেন জগৎহিতায়চ ? পুনরায় ধরাধমে আবির্ভূত হবেন বলে ?

মহাশূন্যে আকাশেরও ওপারের এক আকাশে এইভাবে এই সব মহাত্মাদের ভাসমান দেখতে দেখতে একদিন লেখক আর এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। নীল তখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, মিহি, স্বচ্ছ দর্পণের মত হয়ে উঠেছে। সেই নীল অত্যন্ত একটি সূক্ষ্ম স্রোতে যেন ঘূর্ণাবর্তে ঘূর্ণায়মান হচ্ছে। সেই স্রোতের সামনের দিকে বহু পরিচিত সাধকের সূক্ষ্মদেহ ধীরে ধীরে ভাসমান হয়ে চক্রাবর্তে সরে যাচ্ছে। ওধারে যেন আর একটি সূক্ষ্ম কাচের আড়ালে অপরিচিত অসংখ্য সব মহাত্মা—হয়তো বা যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ট, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র এঁরা। তারই মাঝখানে একটি পরিচিত মুখ দেখে লেখক শিহরিত হয়ে উঠলেন। দেখলেন,—তাঁর বালবিধবা পিসিমা—ছোটবেলায় মাতৃবিয়োগের পর যাঁর কাছে লেখক মানুষ হয়েছিলেন। এই পিসিমা ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেছেন। যেকালে লসমন ঝুলায় যথার্থই দড়ির ঝুলা ছিল তার উপর দিয়ে পায় হেঁটেছেন। দুর্গম হিমালয়ের গিরিপথে কেদারবদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, অমরনাথ কিছুই তিনি বাদ দেননি। সেই হিমালয়ে এক নাঙ্গা সন্ন্যাসী তাঁকে করুণা করে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্মৃতিস্বরূপ দিয়েছিলেন নিজের কাষ্ঠ পাদুকা-জোড়া। পিসিমার জন্য লেখকদের বাড়িতে আলাদা মণ্ডপঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে পিসিমার আসনের উপর বসানো ছিল অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি। এর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিলেন ৺মা কালী। পিসিমা নিত্য মন্ত্রপাঠ করে তাঁদের পুজো করতেন—'এতে সচন্দনে বিল্বপত্রে' ইত্যাদি। এক পাশে আলাদা আসনে ছিল সেই উলঙ্গ জটাধারী নাঙ্গা বাবার ছবি

ও তাঁর কাষ্ঠ পাদুকা-জোড়া। নিত্য পিসিমা তাঁকে চন্দন চর্চিত করতেন।

কেউ এতদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি কি পেয়েছিলেন তিনি। এত ঊর্ধ্ব জগতে ওঠার ছাড়পত্র যে তিনি পেয়েছিলেন ঘুণাক্ষরেও কখন তা লেখকও ভাবতে পারেন নি। পিসিমার সেই সূক্ষ্মদেহ থেকে প্রচণ্ড জ্যোতি বিকিরিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি যেন সূক্ষ্ম অতি স্বচ্ছ কাচের আড়ালে ওধারে আর একটা জগতে বিচরণ করছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নেই। কোথাও কোন আকর্ষণ নেই। প্রত্যেকেই আত্মস্থ। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী কালে যোগ করার সময় লেখকের যে ধারণা হয়েছে এবং পরমাত্মার বিভিন্ন স্তরে জীবাত্মাদের তিনি যেভাবে দেখেছেন, তাতে তাঁর ধারণা, মৃত্যুকালে যে যে অবস্থায় থাকে, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন স্তরে সে সেই অবস্থাতেই বিচরণ করে। জীবাত্মার অস্তিত্ব সাতটি স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের ধূম্রাকৃতি কোন জিনিস দিয়ে জীবাত্মা গঠিত। বৈজ্ঞানিকেরা এই সূক্ষ্ম পদার্থের নাম দিয়েছেন একটোপ্লাজম (ectoplasm)। জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলে যে ধারণা আছে, তা সর্ববিধভাবে মিথ্যা। জীবাত্মা স্থূলদেহের সমপরিমাণ। জীবাত্মার ভার হল তার কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনা এক ধরনের তরঙ্গ—যার অনুসত্তা আছে। সূক্ষ্মদেহে সেই অনুসত্তা ভার সৃষ্টি করে থাকে। যার যত কামনা-বাসনা বেশি তার সূক্ষ্মদেহ তত ভারি। এই কামনা-বাসনাই বেগ সৃষ্টি করে—যাকে ভারতীয় তন্ত্রে বলে সংস্কার। সংস্কারহীন প্রাণসত্তা হল নিম্নস্তরের জৈবিক উপাদান। জীবজগতে মৈথুনের ফলে এই উপাদান সঞ্চিত হলে ধূম্রাকৃতি **ectoplasm** জাতীয় জীবাত্মা তাতে প্রবেশ ক'রে পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে সুপ্ত থাকে। সূক্ষ্মদেহ হাওয়ায় ভাসমান অবস্থায় থাকে। হাওয়ার চারিটি স্তর আছে। এই চার স্তর পর্যন্ত

হাওয়া স্থূল। এর পর আরও তিনটি সূক্ষ্ম হাওয়াস্তর আছে যা প্রায় অস্তিত্বহীন। দেহের সাতটি স্তরের মত পৃথিবীরও সাতটি স্তর আছে। দেহের এই সাতটি স্তর দেহের ষট্‌চক্র ও সপ্ততল দিয়ে গঠিত। যেমন, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সপ্ততল বা নানা রঙ ও জ্যোতির সূক্ষ্মতল। সর্বোপরি রয়েছে মহাশূন্যতাস্বরূপ সৎ বা void। এই এক একটি স্তর অনুযায়ী সূক্ষ্ম অদৃষ্ট কিছু তরঙ্গ মানব-দেহকে ঘিরে আছে। প্রথম ঘিরে আছে স্থূলদেহ। এই দেহ স্থূলজগতে বিচরণ করে। তার উপর সপ্ততল পর্যন্ত এক একটি আবরণ তাকে ঘিরে রয়েছে যেমন, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, চৈতন্যময় কোষ।

যার কামনা-বাসনা অত্যন্ত বেশী স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর একটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত তার সূক্ষ্ম জীবাত্মা-দেহ বায়ুমণ্ডলেই বাস করে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম স্তরে। এরাই ভূত বলে পরিচিত। যার কামনা-বাসনা আর একটু কম সে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে ভাসমান থাকে। যার কামনা-বাসনার ভার আরও কম সে জীবাত্মারূপে তৃতীয় স্তরে ভাসমান থাকে। এই তিনটি স্তর পর্যন্ত বায়ুস্তর স্থূল এবং তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে। সুতরাং যে জীবাত্মা স্থূলদেহের মৃত্যুর পর এই তিন স্তরে বিচরণ করে—তা পার্থিব কামনা-বাসনার দ্বারা এখানেও যেমন আক্রান্ত হয়েছিল সূক্ষ্মস্তরেও তেমনই আক্রান্ত হয়, এবং এরাই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্জন্ম নেয়। এই তিনটি স্তরে জীবাত্মা কামনা-বাসনার যন্ত্রণা ভোগ করে বলে স্তর তিনটি নরক হিসেবে গণ্য। এর উপরের স্তরে অর্থাৎ চতুর্থ স্তরে আবহাওয়ামণ্ডল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এখানে এক ধরনের প্রশান্তি আছে। এ স্তরে কামনা-

বাসনা দ্বারা জীবাত্মা আহত নয়। মানবদেহের এই চতুর্থ স্তর বা চক্র সেইজন্য অনাহত চক্র নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর জীবাত্মা যখন ভাসমান হয়ে এখানে ওঠে তখন অদ্ভুত এক প্রশান্তির স্পর্শ লাভ করে। কিন্তু এই প্রশান্তি তার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ, তার কামনা-বাসনা অত্যন্ত কমে গেলেও এর একটা ভার আছে। মৃত্যুর পর সেই কামনা-বাসনা পুনরায় দানা বাঁধতে থাকে। ভাসমান মেঘ যেমন আর্দ্রতা বেড়ে গেলে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে জীবাত্মাও তেমনই পুনরায় কামনা-বাসনার ঘনীভূত ভারে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। ৫ম স্তর পর্যন্ত এই সূক্ষ্ম কামনা-বাসনা থেকেই যায়। তবে এই সূক্ষ্ম কামনা-বাসনাগুলি দানাবেঁধে ঘনীভূত হতে অনেক সময় নেয়। ফলে এদের জন্ম হতে দেরী হয়। কিন্তু অনাহত চক্রে মৃত্যুর পরমুহূর্তে ভাসমান থেকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জীবাত্মাকে আবার পার্থিব আবহাওয়ামণ্ডলেও লেখক ধ্যানকালে নেমে আসতে দেখেছেন। তবে এ নিতান্তই ব্যতিক্রম। ষষ্ঠতলে ভাসমান আত্মারা প্রকৃতপক্ষে ভারমুক্ত; এই অঞ্চলেই সাধুসন্তরা বিচরণ করেন। এদের একমাত্র ভার 'ইচ্ছা-শক্তি'। জগতের হিতের জন্য এঁরা ইচ্ছে হলে পৃথিবীতে অবতরণ করে পুনরায় অধ্যাত্ম সত্য প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এর ওপরেও চৈতন্যলোকে জ্যোতির্ময় কিছু দেহকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। লেখক নিজে ধ্যানকালে দুটি মাত্র দেহ এখানে দেখেছেন। যেমন, বিন্দুস্থ জ্যোতিতে আলোর দেহে
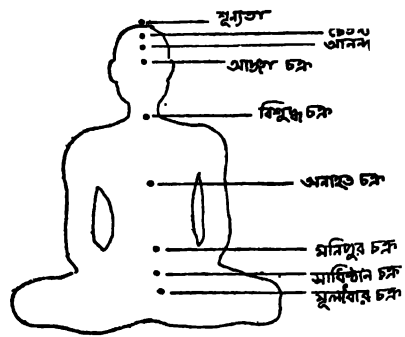
দেহ ও চক্র

মহাপ্রভুকে ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় পদচারণা করতে দেখেছেন। বিন্দুর প্রান্তদেশে দিব্যদেহসম্পন্ন যীশুখৃীষ্টকে তিনি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছেন। এর ওপর তাঁর আর কোন দর্শন হয়নি।

জীবাত্মা পৃথিবীর তিনটি স্তরে কিভাবে ঘোরাফেরা করে এ বিষয়ে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়—পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে তাঁর মৃত পিতৃদেবের জীবাত্মাকে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখে। লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেব ধর্মাত্মা ছিলেন সন্দেহ নেই। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন, এবং এইসব গ্রন্থের অধ্যাত্ম বাক্যের মূল তত্ত্বগুলি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেও লেখকের ধারণা। তবুও প্রশ্ন, তাহলে তিনি মৃত্যুর পর সবুজ ছায়া ছায়া পৃথিবীর আবহাওয়া স্তরের দ্বিতীয় মণ্ডলে পরিভ্রমণ করলেন কেন। তার একটি মাত্র কারণ এই যে, তিনি দেশের জন্য এমন কয়েকটি কাজ করেছিলেন, যা স্বদেশী তত্ত্ব মতে পাপের কাজ না হলেও, লেখকের অন্তরতম সত্তা হয়তো তাতে সাড়া দেয়নি। তিনি অনুশীলন পার্টির তরফে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন। ফলে ইংরেজ পুলিশের ভয়ে তাঁকে সর্বদা আত্মগোপন করে থাকতে হত। তাঁর অন্তস্তলের এই ভীতি তাঁকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত ত্যাগ করেনি। তা ছাড়া অবচেতন মনে জীবহত্যাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। সেইজন্য সেই ভীতি ও পাপবোধ তাঁর জীবাত্মাকে ভারি করে তুলেছিল। ফলে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি দ্বিতীয় স্তরে ভাসমান হন। তাঁর অবচেতন মনের ভীতি সেখানেও তাকে তাড়না করেছিল বলে তিনি এমনভাবে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেন কেউ তাঁকে ধরবার জন্য ধাওয়া করছে। ঠিক তাঁর পেছনে কয়েক হাত দূরেই লেখক একটি জীবাত্মাকে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন—যাঁর পা ছিল ভাঙা। সম্ভবত কোন অ্যাকসিডেণ্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল,—এবং তিনি তা

ব্ঝবার আগেই জীবাত্মার কামনা-বাসনার ভারে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলীর দ্বিতীয় স্তরে ভাসমান হয়েছিলেন। এখানে প্রত্যেকেই নিজস্ব চিন্তাতে এত মগ্ন যে, কাছাকাছি থাকলেও অন্য কোন জীবাত্মাকে কেউ দেখতে পায় না। নিজস্ব মানসজগৎ সৃষ্টি ক'রে সেখানেই তাঁরা বিচরণ করেন। জীবাত্মার মনোময় জগৎ সৃষ্টি করে তাতে বাস করা সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা যে সত্য তাঁর প্রমাণ তিনি পান আপন সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতেন কাটিহারে। প্রায় দশ-বার বছর লেখক কাটিহার যাননি। সুতরাং গৃহ সাজিয়ে কিভাবে তিনি থাকতেন তা লেখক জানতেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লেখক যোগকালে তাঁকে সূক্ষ্ম জগতে তিনি কোথায় অবস্থান করছেন তা দেখবার চেষ্টা করেন। তার রূপ কল্পনা করার ফলে যে চিন্তাতরঙ্গ মস্তিষ্কে উত্থিত হয়, সেই চিন্তাতরঙ্গ অনুরূপ তরঙ্গসম্পন্ন সূক্ষ্মদেহকে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের তৃতীয় স্তরে দেখতে পায়। সেখানে অদ্ভুত অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কাছা দিয়ে ধুতি পরে কোমরে আঁচল জড়িয়েছেন। একটি টেবিলের উপর হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। টেবিলের উপর কতকগুলি বই। সেই টেবিলটি রয়েছে ঘরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। পরে যখন কাটিহার থেকে লোক আসে এবং লেখক তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর ঘরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি টেবিল বসানো ছিল কিনা, সেখানে তিনি লেখাপড়া করতে ভালবাসতেন কিনা, এবং তিনি নগ্ন গাত্রে

ধ্যানে লেখক দৃষ্ট জ্যেষ্ঠ সহোদরের সূক্ষ্মদেহ

অধিকাংশ সময় কোমরে আঁচল বেঁধে ধূতি পরতেন কিনা, সে বলে, হ্যাঁ, তিনি অমনভাবেই চলতেন। এ থেকেই লেখকের ধারণা জন্মে যে, জীবাত্মা সূক্ষ্মলোকে নিজের মানস-ক্ষমতায় পার্থিব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে বাস করবার চেষ্টা করে। যার কল্পনা করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা বেশি সে সেই পরিমণ্ডল সহজেই সৃষ্টি করতে পারে। যার তা নেই, সে বিভ্রান্ত হয়ে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। নিজের পিতৃদেব ও সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবাত্মার বিচরণ ধ্যান-যোগে দেখার সময় লেখকের আর একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে এই যে, সূক্ষ্মস্তরে সূক্ষ্মদেহে অবস্থানকালেও জীবাত্মার কর্মফল বা কামনা-বাসনা সেখানে কাজ করে। কেউ সূক্ষ্মদেহেই কর্মফল কাটিয়ে অন্তর্হিত আরও গূঢ় কর্মফলের জন্য পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে উঠতে পারেন। কেউবা আবার কামনা-বাসনার ভারে সেই তল থেকে নিচেও নামতে পারেন। যেমন, লেখক তাঁর পিতৃদেবকে বছরখানেক পরেই আবহাওয়ামণ্ডলের চতুর্থ স্তরে আনন্দময়ভাবে বিরাজ করতে দেখেছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন অনেকটা সংস্কারমুক্ত ও কামনা-বাসনাহীন মানুষ। যেটুকু তিনি দ্বিতীয় স্তরে ভোগ করেছিলেন তা নিঃস্বার্থ অথচ অবচেতন কল্পনায় পাপকর্ম বিবেচনা হেতু সেইটুকু কর্মফল কাটিয়ে উঠতেই তিনি আরও হাল্কা হন এবং ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। অপরপক্ষে আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে তিনি তৃতীয় তলচ্যুত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বিভ্রান্ত অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে জবুথবু অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছেন। যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনজাত যে কাহিনী মহাভারতে বর্ণিত আছে তা বোধহয় লেখকের ৺পিতৃদেবের নরক ভোগরূপ অভিজ্ঞতা।

সে-যাই হোক মূল কথায় ফিরে আসা যাক। যোগে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতি হবার জন্য স্তরে স্তরে যে-সব অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়, তার কথা বলা যাক।

লেখক তখন আজ্ঞা চক্র ভেদ করে সপ্তস্তরের প্রাথমিক পর্যায়ের সূক্ষ্মস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ অঞ্চলে প্রবেশ কালে প্রথম থেকেই নানা দর্শন হতে থাকে। তাছাড়া আকাশের স্তরগুলি যেন মাঝে মাঝেই অদ্ভুতভাবে রঙ পাল্টায়। এতদিন যে আকাশ ছিল জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম নীল, এবার মাঝে মাঝেই সে আকাশ স্বর্ণবর্ণ গোধূলির আকাশের মত রূপ ধরতে লাগল। বৈদিক-শাস্ত্রে যে হিরণ্যগর্ভ পর্যায়ের কথা লেখা আছে লেখকের মনে হতে লাগল এ যেন তাই। কিছুদিন সেই হিরণ্যগর্ভ পর্যায় স্তরে থাকার পর আবার সূক্ষ্ম নীলাভ জ্যোতির্ময় আকাশ উঁকি দিল। সে আকাশের বুকে যেন কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে। একেই বোধহয় তন্ত্র 'কোটিচন্দ্র সুশীতলম' বলে বর্ণনা করেছে। অকস্মাৎ এরই মধ্যে একদিন চোখের পাতা গাঢ়তর হয়ে উঠে একে অপরের উপর চেপে বসাতে এক সঙ্গে যেন কোটি সূর্য জ্বলে উঠল, তারপরই ঠিক মস্তিষ্কের তুঙ্গ স্থানে অদ্ভুত জাল জাল একটি চিত্র ফুটে উঠল। যেন অতি সূক্ষ্ম মিহি মাকড়শার জাল। তার মধ্যে ছায়া-আলোর খেলা আছে। সেই চিত্রটি দেখতে এই রকম:
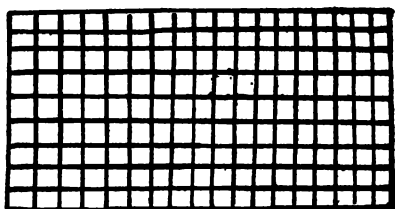
জালের মত সহস্রারের চিত্র

লেখকের মনে হল এই বোধহয় সহস্রার। সে কথা ভাবতে ভাবতেই ভিন্নতর এক জগতের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি।

সহস্রারের সূক্ষ্ম জাল দর্শনের পরেই নীল এত সূক্ষ্মবর্ণ ধারণ করল যে, যেন তা দর্পণের মত হয়ে গেল। সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি ফুটে উঠতে লাগল লেখকের মানসনেত্রে। একদিন

লেখক দেখতে পেলেন ৺মা কালীর মূর্তি। মৃন্ময় প্রতিমার মত। লেখকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু গতি নেই। তার কয়েকদিন পরেই ছায়া ছায়া রঙের এমন সুন্দর ৺মায়ের মূর্তি দেখতে পেলেন যার তুলনা নেই। এ মূর্তি যেন গতিময়। তাঁর নরমুণ্ডমালা যেন সদ্য কর্তিত মানুষের মুণ্ড দিয়ে তৈরি। ঐ ভয়াবহ ভঙ্গীতেও ৺মা এত লাবণ্যময়ী যে, সে সৌন্দর্যের যেন তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। ৺মা যেন চলচ্চিত্রের পর্দায় জীবন্তভঙ্গীতে চলমানা। লেখক মানসনেত্রেই সেই আদি রমণীরূপের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ধ্যানময় অবস্থাতেই তিনি মনে মনে চিন্তা করে বুঝবার চেষ্টা করলেন যে, কি দেখছেন তিনি— নিজের অবচেতন মনের প্রতিফলন? না দেশে (space) কোন সূক্ষ্মতরঙ্গের সূক্ষ্ম মূর্তি? ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ভয়ঙ্করীর মধ্যে এমন অনবদ্য লাবণ্যময়ী রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অদ্ভুত একটা নেশা যেন তাঁকে আশ্চর্যভাবে টানতে লাগল। রাতের পর রাত তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আবার সেই অনন্তবিস্তার আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্রকিরণ ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে লেখক আর একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পদ্মাসনে বসা তার দেহটা যেন ক্রমশ হাল্কা হয়ে উঠে যাচ্ছে। তারপর উঠে যেতে যেতে সেই দেহটা সম্পূর্ণ উল্টে গেল। মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র রইল নিচে, পদ্মাসনাবদ্ধ পা রইল উপরে। অভূতপূর্ব একটি যৌগিক আনন্দ অনুভূত হতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে যেন ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রারমণ্ডল থেকে অদ্ভুত এক স্নিগ্ধজ্যোতি জগৎব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে অনন্ত জ্যোতি বিকিরণ করতে লাগল। অদ্ভুত এক দিব্যানুভূতি যেন সারা দেহে রোমাঞ্চকর শিহরণ বুলিয়ে দিতে থাকল। হঠাৎ লেখকের মনে পড়ে গেল, এমনি ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ সাধনা করে যোগক্ষেম অর্জন করেছিলেন। পুরুষোত্তম এই যোগ নিজে করেছিলেন বলে এর

নাম 'পুরুষোত্তম' যোগ। দৈত্যরা বোধহয় এই গুহ্য যোগ সাধনার কথা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তারাও পরবর্তীকালে শক্তিকে সহজে করায়ত্ত করে হেঁটমুণ্ড হয়ে সাধনা করতেন। লেখকের যোগসাধনার ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হল যেন।

এরপর থেকে যোগে বসলেই লেখকের মনে হত যে, কি এক মহাশক্তি মূলাধার অঞ্চল থেকে উঠে লেখকের সারাদেহকে হাল্কা করে দিচ্ছে এবং তাঁকে উপরে তুলে নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষেই দেহ কতদূর উপরে উঠে যেত বোঝার উপায় নেই। কিন্তু চেতনাতে মনে হত দেহ যেন আসন ত্যাগ করে উপরে উঠে গেছে। অনেকদিন লেখক আসনে হাত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতেন দেহ সত্যি সত্যিই আসন ত্যাগ করে উপরে উঠেছে কিনা। কোন কোন দিন মনে হত সত্যিই দেহ আসন ছেড়ে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে। কোন কোন দিন বা দেখা যেত যে, দেহ আসন সংলগ্নই রয়েছে। অথচ বোধটা এমন হচ্ছে যে, দেহ আসন ত্যাগ করে উপরে উঠে গেছে।

এই নতুন অভিজ্ঞতার স্তর পার না হতে হতেই লেখক একবার প্রচণ্ড রকমের অবাক হয়ে গেলেন আর একটি দৃশ্য দেখে। যেন ধারে কাছেই খুব পরিচিত একটি স্থানে বিরাট এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মস্তিষ্কে টাক। কিন্তু ঘাড়ের কাছে চুল লম্বা। ভারতীয় সাধকদের মত শমশ্রুগুম্ফ। পরনে তাঁদেরই মত কোমরে জড়ানো কাছাবিহীন শ্বেতকৌপীন। দেহ নগ্ন। লোকটি এত লম্বা যে দেখলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বেশ কয়েকদিন ঐ একই স্থানে তিনি লোকটিকে দেখতে পান। এর পরই লেখকের আর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। মনে হয়, যেন এই পৃথিবীতে নয়, অথচ স্থূল কোন লোকে অতি দীর্ঘ পদচারণায় কে হাঁটছে। লোকটির কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তার

উপরে নয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তার পরনে ধুতি। দেহ নগ্ন। পায়ে স্যাণ্ডেল। হেঁটে কোথায় চলেছে যেন। পর পর

যোগে দেখা দীর্ঘাকৃতি লোক

কয়েকদিন হণ্টনরত এই পা দুটিকেই দেখলেন লেখক। পায়ের পাতা এবং কোমর অবধি দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে, কমপক্ষে দ্বিতল একটি গৃহের উচ্চতাসম্পন্ন এই লোকটি। ঠিক সেই মুহূর্তে লেখকের মনে একটি দুশ্চিন্তার উদয় হয়। তাঁর ধারণা হয় যে, অলৌকিক জগতের সন্ধান পেতে গিয়ে দীক্ষা না নিয়ে যোগ করার ফলে কোথাও কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এর পরই তিনি এই বিন্দুধ্যান থেকে বিরত হবার চেষ্টা করেন—পাছে তাঁর জৈবসত্তায় বা চিন্তাধারায় কোন বিকৃতি দেখা দেয়। কারণ, তিনি শুনেছেন যে, গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ না পেয়ে এ গুহ্যবিদ্যার পথে পা বাড়াতে গেলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই ধরনের চিন্তা করে লেখক যখন বিভ্রান্ত হতে যাচ্ছেন, তখন আর একবার তিনি চমকে যান অদ্ভুত আর এক ব্যক্তির

সাক্ষাৎ পেয়ে। একটি বিবাহবাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। অত্যন্ত সুশ্রী এবং জ্যোতির্ময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই লোকটি তাঁকে দেখতে পেয়েই হাসি মুখে বললেন, লম্বা লোক দেখে ভয় পাচ্ছেন কেন? চিন্তা নেই, ঠিক পথেই এগুচ্ছেন। এরা পৃথিবীর নিকটবর্তী কোন গ্রহের প্রাণী। আমাদের সৌরমণ্ডলের নয়, অন্য কোন সৌরমণ্ডলের। তবে পৃথিবী থেকে সব চাইতে প্রাণীময় নিকটবর্তী গ্রহ। যোগে সূক্ষ্মদেহ আকাশপথে কল্পনাতীত দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতে পারে। মনে রাখবেন— আপনি এখন সূক্ষ্মদেহে তন্ত্রের কূটস্থান পরিক্রমা আরম্ভ করেছেন। উৎসে যেতে হলে জগতের অভিজ্ঞতা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শূন্যে যাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য যৌন অভিজ্ঞতার অভাব থাকার জন্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারেন নি। ফলে কোন এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করে এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সঞ্চয় করতে হয়েছিল। এ-পথ পরিত্যাগ করবেন না। অতীন্দ্রিয় জগতের বহু অভিজ্ঞতা আপনার হবে। একটি ডায়েরী মেনটেন করবেন। এতে আপনার এবং জগতের সকলেরই কল্যাণ হবে।

লোকটির মুখে অবিশ্বাস্য এই কথা শুনে যেই লেখক তাঁকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাবেন, তক্ষুনি দেখেন ভিড়ের মধ্যে কোথায় তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তখন লেখক শুধু চিন্তা করতে থাকেন, এও কি সম্ভব! কোথায়, কোন্ গভীর নিশীথে লেখক ধ্যানজগতে বসে মানসনেত্রে কি দেখছেন, তাও অপর লোকের পক্ষে বলে দেওয়া সম্ভব? সবটাই কোথাও একটা বিরাট রকমের ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

কিন্তু পরে লেখক নিজেই এর জবাব পেয়ে যান। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর দেবাশিষ মিত্রের সঙ্গে একবার তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে যান। পরীক্ষা নিয়ামক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক জেনেই তিনি

সেখানে গিয়েছিলেন। গোপালবাবু তখন ভাইস চ্যান্সেলারের কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিং-এ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসা এত প্রবল যে, খবর পেয়ে তিনি কয়েক মিনিটের জন্য হলেও লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সময়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং এসেই প্রশ্ন করলেন, মণিপুর ভেদ করতে পারছি না। বলুন! লেখক মুহূর্ত মাত্র চোখ বুজে অদ্ভুত দুটি জিনিস দেখে চমকে ওঠেন। দৃশ্য দুটি এই: তেজোমণ্ডলে একটি বিন্দু জ্বলছে। অর্থাৎ গোপালবাবু পূর্ণ মণিপুরচক্রে বিচরণ করে বিন্দু দর্শন করছেন। তারপরই দেখেন দীর্ঘাকৃতি দুটি পা। যে দীর্ঘ মানবদেহ লেখক যোগের অনেক উচ্চ পর্যায়ে উঠে দেখতে পেয়েছিলেন—যোগভূমির তৃতীয় স্তরে থেকেও গোপালবাবু ভিন্নগ্রহের সেই প্রাণী দর্শন করছেন। লেখক গোপালবাবুকে বললেন: যার বিন্দু দর্শন হয়, তার মণিপুর-চক্র ভেদ হতে সময় লাগবে কেন? গোপালবাবু বললেন, সাত বছর এই মণিপুরচক্রে ঘোরাফেরা করছি। লেখক বললেন, সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে দু'মাসেই এবার অনাহতচক্রের নীল বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করতে পারবেন।

—দয়া করে আমাকে সেই পথ বলে দিন।

—বিন্দুতে মন রেখে চুপ করে বসে থাকুন, আর কিছু করতে হবে না। এর পর মানসনেত্রে যে-সব চিত্র ভেসে ওঠে, দেখে যান। স্বাভাবিকভাবেই দেহের ভেতর প্রাণবায়ু ও যোগক্রিয়া আরম্ভ হয়ে কুল (শক্তি)-কুণ্ড (গর্ত)-লিনী মূলাধার থেকে সহস্রারের দিকে অগ্রসর হবে। স্তরে স্তরে দেহচক্রগুলি ভেদ করে এগুতে থাকবে সে। মনে রাখবেন, কোন কিছুতে মনসংযোগ করা মানেই বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করা। বায়ু তখন ক্রমশ ধীরগতি ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠে কুণ্ডে (গর্তে, মূলাধারে) অবস্থিত কুল(শক্তি)-কে আঘাত করে ঊর্ধ্বদিকে তুলতে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশের

কোষগুলি এমন করে তৈরি যে, শক্তি সেই অঞ্চলে উঠলেই তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠে নানা ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। ফলে নানা রঙ দর্শন হতে থাকে। নানা দৃশ্যও দেখা যায়, যেমন, আপনি দীর্ঘ লোক দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছেন।

গোপালবাবুর যেন বিস্ময়ের সীমা থাকল না। কিছুক্ষণ পরে বললেন, আশ্চর্য! আপনি তা জানলেন কি করে! লেখক বললেন, যোগে একটি নির্দিষ্ট স্তর অর্থাৎ জ্যোতির্মণ্ডলে উঠলেই চোখবোজা মাত্র মানুষের অন্তরের অবস্থা বা প্রশ্ন সবই স্পষ্ট দেখা যায়।

—এই দীর্ঘদেহী লোকটি কে? আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি। তাঁরা বলেন আমার পূর্ব জন্মের গুরু।

—না।

—তবে?

—এঁরা হলেন ভিন্ন গ্রহের প্রাণী। পরে বুঝতে পারবেন।

গোপালবাবুর খুব তাড়া। বললেন, আপনার কাছে অনেক কিছু জানতে হবে। আর একদিন আসুন। আসবেন কিন্তু। তিনি চলে গেলেন।

এর পর গোপালবাবুর সঙ্গে লেখকের বহুদিন সাক্ষাৎ হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি লেখকের পদ্ধতি অনুসরণ করে অনাহতচক্রের নীল আকাশে বিচরণ করেছেন।

তাঁর এই সাফল্যে গোপালবাবু যখন বেশ কিছুটা উৎফুল্ল সেই সময় আর একবার তাঁর সঙ্গে লেখকের দেখা। গোপালবাবুর তখনও বেশ ব্যস্ততা। তক্ষুনি ভাইস চ্যান্সেলরের ঘরে মিটিং-এ যেতে হবে। তিনি জানিয়ে দিলেন, পনের মিনিট দেরী হবে।

লেখক এতে বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ করে মুহূর্তের মধ্যে চোখ বুজে গোপালবাবুর যোগবায়ুর অবস্থান কোন স্তরে তা জেনে নিলেন। বুঝতে পারলেন, মণিপুরের প্রান্তভাগ ছাড়িয়ে

তিনি অনাহতচক্রমণ্ডলে প্রবেশ করেছেন। ময়ূর ছানার কণ্ঠে ফুটন্ত নীলের মত তাঁর অন্তরাকাশেও খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ উঁকি দিচ্ছে। তাছাড়া নিজের হৃদ্‌দর্পণে গোপালবাবু অদ্ভুত এক ছবি দেখে রীতিমত চমকিত হচ্ছেন। লেখক চোখবুজেই দেখতে পেলেন, গোপালবাবুর বুকের মধ্যে দুটি ছবি। একটি গোপালবাবুর নিজের, আর একটি আত্মার দর্পণে পাশ্বর্দেশ থেকে দেখা নিজেরই প্রতিবিম্ব। নিজের এই প্রতিবিম্ব দেখে গোপালবাবু বেশ চমকিত হচ্ছেন। লেখক বললেন, পাশ থেকে নিজেকে দেখে চমকে যাচ্ছেন তো?

গোপালবাবু বললেন, আশ্চর্য! এই কথাটা জিজ্ঞেস করব বলেই মিটিং-এ যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছি।

লেখক বললেন, এ প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। মনে রাখবেন, পরমাত্মার বিশেষ এক স্তরের স্বচ্ছ সত্তায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন। এ হল আপনার আত্মদর্শনের শুরু। তারপর একদিন যখন নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি স্পষ্টভাবে দাঁড়াবেন, তখনই বুঝবেন আত্মদর্শন পূর্ণ হয়েছে। আপনি এবার দ্রুত ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকবেন সন্দেহ নেই। মিটিং-এ যান, পরে দেখা হবে।

গোপালবাবু চলে গেলেন।

একটি লোক মানুষের অন্তর্দর্শন দেখবার অধিকারী কখন কিভাবে হন আজ লেখক নিজের অভিজ্ঞতায় তা বুঝতে পারলেও সেদিন তা পারেন নি। তাই তিনি চমকিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই চমক তাঁকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি, এই তাঁর লাভ। বোধহয় অতীন্দ্রিয় একটি শক্তিই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঠিক প্রয়োজনীয় জিনিসটিই দান করেন। আমাদের অজ্ঞাতসারেই একটি অতীন্দ্রিয় ইচ্ছাশক্তি আমাদের পরিচালিত করে। এবং লেখকও বহুবার সেই শক্তির পরিচালনার সম্মুখীন হতে পেরে-

ছিলেন বলেই আজ অধ্যাত্মজগৎ সম্পর্কে তাঁর যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ হয়েছে। পরমাত্মার এ হয়তো এক অহৈতুকী করুণা। যাক, সে সব কথা এখন থাক। যে কথা বলার জন্য এই লেখনী ধারণ, এবার সেই অতীন্দ্রিয় সত্তায় যোগকালে লেখকের অন্যান্য গ্রহে নানা ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলা যাক।

সপ্ততলে স্থূলদেহস্থ ষট্চক্রের রঙের খেলার পুণরাবৃত্তি প্রায় শেষ হতে চলেছে। তন্মাত্র (essence) নীল তখন স্বচ্ছ দর্পণের মত বিরাট আকাশ বিস্তার করে দাঁড়াচেছ। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র অকস্মাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেই হারিয়ে যাচেছ। মহাশূন্যে অসংখ্য শব্দতরঙ্গ ভেসে বেড়াচেছ। এরই মাঝে মাঝে কুল-কুণ্ডলিনী প্রাণীময় গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করাচেছ। একদিন লেখক দেখলেন—অনন্ত জলরাশি মহাসমুদ্রের কূলকিনারাহীন ব্যাপ্ততায় অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ঢেউ তুলে লাফাচেছ। জল, জল, চারিদিকে শুধু জল, জল আর জল। দিক্চক্রবাল পৃথিবীর আকাশেরই মত বিশাল প্রান্তরেখায় নুইয়ে পড়েছে। আকাশের সূক্ষ্ম নীলের উপর মিহি ধোঁয়ার আস্তরণ। বাঁ দিকে বহুদূরে মহা বিশাল অরণ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও অন্যত্র দিক্চক্রবালে কোথাও স্থূলতার চিহ্ন মাত্র নেই। আকাশের ছায়া পড়ে সাগরের নীলও অনুরূপ বর্ণ ধারণ করেছে। একমাত্র প্রাণী দেখা যাচেছ জলচর মাছ। তারা ঊর্ধ্বে কি দেখে যেন ক্ষুধার্ত হয়ে তা ধরবার জন্য লাফাচেছ। লেখকের অন্তস্তল থেকে কে যেন ইঙ্গিত দিতে লাগল—এ হল ভিন্ন গ্রহ। এ গ্রহে কেবলমাত্র জীবনের সঞ্চার হয়েছে। মৎস্যরূপে সেই জীবন সাগরের বুকে খেলা করে বেড়াচেছ। কিন্তু তারা এত ভয়ঙ্কর-ভাবে লাফাচেছ কি জন্য? লেখকের তখনই মনে হল—তার সূক্ষ্ম সত্তাকে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহকে এই জলচর প্রাণীগুলি দেখতে

পেয়েছে। সেইজন্য তারা লাফাচেছ। বস্তুত মানবেতর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি বেশি। তারা সূক্ষ্ম জিনিসও দেখতে পায় এবং সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পায়। যে জন্য মানুষের স্থূলকর্ণে শ্রুত না হলেও কুকুরেরা সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পেয়ে অনেক সময়ই মানুষের মতে—অকারণে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু এদের শ্রুতি সাব্‌সনিক ও সুপারসনিক শব্দ শুনতে পায় বলেই তারা এমন করে থাকে। সম্ভবত এই দৈত্যাকার মৎস্যগুলি লেখকের সূক্ষ্মদেহকে দেখতে পেয়ে তা ধরবার জন্যই এমন করে লাফাচ্ছিল। এই ধরনের গ্রহ-গুলি অন্য কোন সৌরমণ্ডলের। এগুলো সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে ফুটে উঠে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ফলে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে যে-তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হয় সেই তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সির সমান্তরাল অবস্থান হেতু। অর্থাৎ গ্রহগুলির তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সি লেখকের তৎকালীন মস্তিষ্ক-তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সির সমান্তরাল হয় বলেই এগুলি তার তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ ব্রেনের visual nerve-এ ধরা পড়ে।

যোগে অদ্ভুত একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। যখন দেহাভ্যন্তরস্থ কুলকুণ্ডলিনী মেরুদণ্ড পথে ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকে, তখন বিভিন্ন স্তরে তার সমান্তরাল ফ্রিকোয়েন্সির দৃশ্য বেশ কিছুদিন দেখা যায়। এর কারণ হয়তো দুটি ঃ—এক একটা বৃত্তের নিজস্ব পরিধি অত্যন্ত বৃহৎ। যেমন, যখন লাল রঙের বৃত্তে থাকা যায় তখন বহুদিন ধরে লাল রঙই দেখা যায়। এই লাল রঙ যে শুধু মৃত্তিকাতেই আছে তা নয়, পৃথিবীর স্থূল বায়ুমণ্ডলের পরিধি অবধি এর বিস্তার। এবং এই বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। ফলে এমনি কোন পার্থিব জিনিস যদি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠতে চায় তাহলে একদিকে তাকে বিস্তৃত পরিধির বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে হবে, অন্যদিকে পার্থিব বিরাট অভিকর্ষকেও পার হতে হবে।

ফলে বেশ কিছুদিন শক্তিকে এই অঞ্চল পার হতে ব্যয় করতে হয়। শক্তি তীব্রতর হয়ে উঠলে তবেই রকেটের মত তা পার্থিব অভি-কর্ষের একটি বৃত্ত অতিক্রম করতে পারে।

অ্যাট্‌মোস্ফীয়ার নিয়েই হল পৃথিবী। এর উর্ধ্বে রয়েছে জলমণ্ডল। জলমণ্ডল যে জলময়, তা নয়। জলের সূক্ষ্ম উপাদান এই মণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্র অতিক্রম করার পথে দীর্ঘদিন এই মণ্ডলে ঘুরতে থাকে। এখানে অভিকর্ষের টান একটু কম থাকে বটে কিন্তু বৃত্তের পরিধি বৃহত্তর। শক্তির গতি এখানে আর একটু বাড়ে বটে, তবে বৃত্তের পরিধি বৃহত্তর বলে পার্থিবমণ্ডল অতিক্রম করার মত একই সময় নেয়।

এই প্রসঙ্গে চক্রের অবস্থানগুলিও লক্ষ্য করার মত। দেহের ছটি চক্র, যাকে পদ্ম হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তা বিভিন্ন দল নিয়ে দেহের বিভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত। যেমন, মূলাধারে আছে চতুর্দল পদ্ম। দলগুলি এই রকম :—
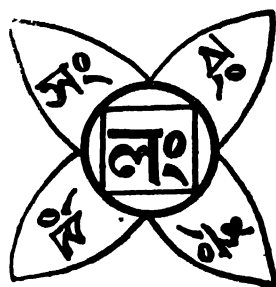
মূলাধার চক্র

মূলাধার পদ্মের কেন্দ্রস্থলে লং শব্দটি লেখা রয়েছে। 'লং'ই হল এর মূলভিত্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে 'ল' শব্দটি হলুদ বর্ণের হলেও, এই হলুদ বর্ণ তার অন্তর্নিহিত তেজ মাত্র। এর চতুর্দিকে চারটি বর্ণ হল বং, শং, ষং, সং। এর চারটি দলে যে বর্ণ আছে তার রঙ হল—ব = পলাল ধূম্রবর্ণ, শ = হলুদ, ষ = চন্দ্রালোক, স = কোটি বিদ্যুল্লতাকার। এক একটি রঙের এক একটি ফ্রিকোয়েন্সি আছে। সব মিলিয়ে যে প্রভাব তৈরি হয় তা রক্তবর্ণ স্বরূপ। এর মূল বা essence অর্থাৎ তন্মাত্র হলুদ বর্ণ। আজ্ঞা চক্র অঞ্চলে

না গেলে তা বোঝা যায় না। এই পদ্মের বা চক্রের দেবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে হংসারূঢ় বালসূর্যবর্ণ ব্রহ্মাকে। শক্তি হিসেবে রয়েছে ডাকিনী। ডাকিনী শব্দের অর্থ জ্ঞানী রমণী। সম্ভবত এই চক্রে প্রথম জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। ভিন্নমতে এই শক্তি কামশক্তি। অন্যমতে এই শক্তির নাম শাকিনী (Woodroffe)। মূলাধারে আছে অস্থিধাতুর শক্তি।

অ্যাটমিক রিয়্যাকটরে যেমন বিস্ফোরিত শক্তি চেন রি-অ্যাকশনে ক্রমশ শক্তিশালী হয়, মূলাধারস্থ শক্তি জাগ্রত হলে তেমনই ক্রমশ তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে নতুন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে।

স্বাধিষ্ঠান চক্র

সেইজন্য এক একটি স্তরের মূল শক্তিকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চারপাশে শক্তির তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সি রূপ নানা দল দেওয়া হয়েছে। চেন রি-অ্যাকশনে বিস্ফোরণের ফলে শক্তি এগুতে থাকলে ক্রমশ তার ফ্রিকোয়েন্সি [illegible] থাকাতে, wave-length ছোট হতে থাকে। সেইজন্য দেহচক্রের দ্বিতীয় স্থানে যে পদ্মটি বসানো হয়েছে তার দল আরো বেশি। চারের বদলে পদ্মের দলের সংখ্যা এখানে ছটি। যেমন উপরের ছবি অনুযায়ী স্বাধিষ্ঠান চক্র। এই চক্রের দলগুলিতে যে বর্ণ বসানো হয়েছে তা হল কেন্দ্রস্থ 'বং'-এর চতুর্দিকে—লং, বং, ভং, মং, যং, রং।

এই বর্ণগুলোর দ্যুতি হল এই ধরনের : কেন্দ্রস্থ ব—পলাল ধূম্র, ল—হলুদ, ব—পলাল ধূম্র, ভ—তরুণ আদিত্যবর্ণ, ম—প্রভাত সূর্যবর্ণ, য—পলাল ধূম্র, র—রক্তবিদ্যুল্লতাকার। মূল

উপরিস্থিত চিত্রে অং-এর জায়গায় লং হইবে।

ক্ষেত্র পলাল ধূম্রবর্ণের হলেও অন্যান্য শক্তির ফ্রিকোয়েন্সি একত্রে এমন এক বর্ণ সৃষ্টি করে যা সবুজ এবং আয়তন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ধূসর ছায়াকার হয়ে যায়। এ অঞ্চলের দেবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে নীলবর্ণ বিষ্ণুকে। শক্তি হিসেবে দেবী রাকিণীকে। বর্ণের বিচারে রাকিণী মধ্যমাশক্তি। ভিন্নমতে এদঞ্চলের শক্তির নাম কাকিণী, মেদধাতু শক্তি।

দেহচক্রের তৃতীয় ক্রম ঊর্ধ্বস্তরে রয়েছে মণিপুর চক্র। এর দল হল দশটি। কেন্দ্রস্থবর্ণ 'রং' চক্রটির দশটি দলে রয়েছে দশটি বর্ণ :—ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং।

মণিপুর চক্র

বর্ণগুলির রঙ এই ধরনের :

ভিত্তি—র = রক্তবিদ্যুল্লতাকার

দলসমূহ : ড = পীত

ঢ = রক্তবিদ্যুল্লতাকার

ণ = পীত বিদ্যুল্লতাকার

ত = পীত

থ = তরুণ সূর্য প্রভাসম্পন্ন

দ = নিরাকার শক্তি

ধ = নিরাকার শক্তিসদৃশ

ন = রক্ত বিদ্যুল্লতাকার

প = শরচ্চন্দ্রপ্রভা সম্পন্ন

ফ = রক্ত বিদ্যুল্লতাকার

মণিপুর চক্রের মূল 'র' বর্ণের চতুর্দিকে দশদলের দশ বর্ণ

মিলে যে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হয় তার বর্ণ মধ্যাহ্ন আকাশের তেজোময় মেঘের মত। এই চক্রের দেবতা ভীষণশক্তি রুদ্র। শক্তি—লাকিনী। বর্ণশক্তি বিচারে প্রচণ্ড অথচ সীমিত তেজশক্তি।

অনাহত চক্র

বৌদ্ধমতে স্কন্ধধাতুরা শক্তি। ভিন্ন মতেও এই অঞ্চলের শক্তির নাম লাকিনী। তিনি মাংস ধাতুর শক্তি।

এর পরবর্তী ঊর্ধ্ব চক্রের নাম, অনাহত। এই চক্রের মূলে রয়েছে 'যং' বর্ণ। এই চক্ররূপ পদ্মের দল বারটি, তাতে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং, টং, ঠং ইত্যাদি বারটি অক্ষর বা বর্ণ রয়েছে। দেখতে এইরকম ঃ—

এই অনাহত চক্রের মূল ভিত্তিভূমি বা বর্ণ বা স্পন্দন হল ঃ—

য — পলাল ধূম্রবর্ণ
ক — হলুদাভ শঙ্খের মত
খ — শ্বেতবর্ণ
গ — অরুণাদিত্য বর্ণ
ঘ — অরুণাদিত্য বর্ণ
ঙ — বর্ণহীন শক্তি
চ — রক্তবিদ্যুল্লতাকার
ছ — পীতবিদ্যুল্লতাকার
জ — শরচ্চন্দ্র কিরণ সদৃশ
ঝ — রক্তবিদ্যুল্লতাকার
ঞ — রক্ত বিদ্যুল্লতাকার
ট — কোটিবিদ্যুল্লতাকার
ঠ — পীতবিদ্যুল্লতাকার

সব মিলিয়ে যে বর্ণাভা তৈরি করে তাহল নীল। এই চক্রের

অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন ঈশ, শক্তি কাকিনী। বর্ণশক্তি হিসেবে মধ্যমা শক্তি। ভিন্নমতে এ অঞ্চলের শক্তির নাম রাকিনী। তিনি রক্ত ধাতুর শক্তি। হৃৎপিণ্ডই রক্তের মূল স্থান সন্দেহ নেই।

অনাহত চক্রের উপরে রয়েছে বিশুদ্ধ চক্র। এর ভিত্তি বর্ণ হল 'হং'। এর চক্রে যে পদ্মের ছবি আঁকা হয়েছে তার দল ষোলটি। এই পদ্মদলে ষোলটি স্বরবর্ণ রয়েছে। পদ্মটি এই রকম ঃ

এই চক্রের কেন্দ্রস্থিত 'হং' এর চক্রে যে পদ্মের ছবি আঁকা হয়েছে তার দল ষোলটি। এই ষোলটি পদ্মদলে ষোলটি স্বরবর্ণ রয়েছে। পদ্মটি এই রকম ঃ অন্যান্য দলের বর্ণ হল অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ঋৃং, ঌং, ঌৗং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ। বর্ণগুলির তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সি নিম্নরূপ ঃ—

বিশুদ্ধ চক্র

ভিত্তিবর্ণ-হ — রক্তবিদ্যুল্লতোপম

অ — শঙ্খশুভ্র জ্যোতির্ময়

আ — কালো, নীল ও লালবর্ণ

ই — কালো ও নীল

ঈ — পীতবর্ণ

উ — ।ীত চম্পকতুল্য

ঊ — পীতবিদ্যুল্লতাকার

ঋ — রক্তবিদ্যুল্লতাকার

ঋৃ — পীতবিদ্যুল্লতাকার

ঌ — পীতবিদ্যুল্লতাকার

৯৯ — পূর্ণচন্দ্রপ্রভ

এ — রক্তবর্ণ

ঐ = কালো, নীল, রক্ত

ও = রক্তবিদ্যুল্লতাকার

ঔ = বর্ণহীন শক্তি

অং — পীতবিদ্যুৎসমপ্রভ

অঃ — রক্তবিদ্যুৎপ্রভাময়

এই সকল বর্ণের সমষ্টিগত ফ্রিকোয়েন্সির ফল হল গাঢ় নীল বর্ণ। এই চক্রের দেবতা হলেন সদাশিব। শক্তির নাম শাকিনী। বর্ণ বিচারে স্নিগ্ধশক্তি। বৌদ্ধমতে সুবেশা যোগিনী। ভিন্নমতে এ অঞ্চলের শক্তি হলেন ডাকিনী। ইনি ত্বকধাতুশক্তি।

এর উপর রয়েছে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্র। এই চক্রের দল দুটি। চক্রের আকৃতি নিম্নরূপ :

এই দ্বিদল পদ্মের ভিত্তি বর্ণ হল—

ওঁ = কৃষ্ণ (void), শ্বেত জ্যোতি (বিন্দু) অর্ধচন্দ্রপ্রভা (ᴗ) এবং

ও = রক্তবর্ণ

o — শূন্য

· = বিন্দু

ᴗ — অর্ধচন্দ্র

ও — রক্তবর্ণ

হ — রক্তবিদ্যুল্লতোপম

ক্ষ = শরচ্চন্দ্রসন্নিভদ্যুতিসম্পন্ন।

এই সব বর্ণের সমষ্টিগত ফল হল বর্ণ বিস্ফোরণ, নানাবর্ণের খেলা। নিম্নস্থ শক্তি এই অঞ্চলে উঠে ঘনীভূত শক্তিকে বিস্ফোরিত

করে দিয়ে নানা রঙ ছড়িয়ে দেয়। এ অঞ্চলে দেবতা হলেন হংসরূপী পরম শিব। শক্তি হলেন হাকিনী। বৌদ্ধমতে চিৎকার-কারিণী যোগিনী। লেখকের মতে বিস্ফোরণের অঞ্চল অর্থাৎ কোলাহলের অঞ্চল। ভিন্নমতেও এ অঞ্চলের শক্তির নাম হাকিনী। ইনি মজ্জাধাতুশক্তির প্রতীক। মূলত মজ্জাশক্তিই আসল শক্তি। কারণ মেরুদণ্ডের শক্তিই মানবের শ্রেষ্ঠ শক্তি।

চেন রি-অ্যাকশনে শক্তি এক একটি অঞ্চলে এসে অধিকতর শক্তি ও বেশি ক্ষমতাশালী ফ্রিকোয়েন্সির মুখোমুখি হয়। শক্তি যত বেশি, এক একটি স্তরের বৃত্তপরিধিও তত বেশি। ফলে ক্রম ঊর্ধ্বগতিতে যতই উপরে ওঠা যায় ততই এক একটি চক্রের রঙ বেশি দিন ধরে মানসনেত্রে ভাসতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাজ এখানে কম থাকলেও চেতনাকে ঊর্ধ্বতর চক্রের বৃত্তমণ্ডল পার হতে বেশি সময় দিতে হয়। এর কারণ, এই সময় ঊর্ধ্ব অঞ্চলের বৃত্তের পরিধি খুব বেশি হয়। ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দর্শন বেশ কিছুদিন ধরে চলে। সৌরমণ্ডলের বাইরের প্রাণী অধ্যুষিত গ্রহগুলি বিশেষত দুটি বৃত্তের মধ্যে পড়ে, যেমন অনাহত ও বিশুদ্ধ। এই দুইটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ধরনের গ্রহে জীবন্ত নানা প্রকার প্রাণী লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য প্রাণী-গ্রহের বেশ কয়েকটি লক্ষ্য করতেই এসময় অনেকদিন কেটে যায়। সুতরাং একবার যখন ভিন্ন গ্রহ দর্শন আরম্ভ হল তখন তা বেশ কিছুদিন ধরেই চলল।

জলপূর্ণ গ্রহে বিরাটাকার মৎস্য জাতীয় প্রাণীদেরই বেশ কিছুদিন ধরে লেখক দেখলেন। এরপরই হঠাৎ একদিন ভিন্ন ধরনের এক গ্রহের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে তাঁর মস্তিষ্ক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি এক হয়ে নতুনতর এক দৃশ্য দর্শন করাল।

এক ধরনের উজ্জ্বল তেজোময় আলোতে গ্রহটি উদ্ভাসিত। গ্রহটির সর্বাঙ্গীন দর্শন যে লেখকের হয়েছিল তা নয়, অর্থাৎ যেমন করে মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবী দর্শন করেন বা

রকেটে থেকে চন্দ্র বা পৃথিবীর সর্বাঙ্গীন দৃশ্যের স্বাদ নেন। এ হল কোন ভিন্ন এক গ্রহের আংশিক দৃশ্য। কোন এক অরণ্যের প্রান্তদেশ। গভীর নিবিড় শ্যামলের শ্যামলিমা নেই। প্রখর রোদে যেন কিছুটা ঝলসানো। নিচে মাটিও যেন অগ্নিদগ্ধ। কয়েকটি পত্রবিহীন কণ্টকলতা এদিক ওদিক ছড়িয়ে। হয়তো নিকটে কোন পাহাড় আছে। হয়তো সেটা কোন অধিত্যকা। এই গ্রহের গভীর ভেতরে কি আছে সেটা অনুমান করার আগেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন যেন লেখক। দেখলেন, নিচে হিংস্র এক নেকড়ে। উর্ধ্বে কি দেখছে কে জানে! শাণিত দাঁতগুলি বের করে কিছু একটা যেন ধরবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর মাটিতে যোগাসনে বসে লেখক সে দৃশ্য দেখে চমকে গেলেন। নিজেই ভয় পেতে লাগলেন। অথচ নেকড়েটার মুখের উপর দিকে তাকিয়ে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তা ছাড়া আশেপাশেও অন্য কোন প্রাণী নেই যা দেখে সে ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। উজ্জ্বল কোন অদৃশ্য সূর্যালোকে নেকড়েটাও যেন তীব্র দিনের আলোতে জ্বলছে। ধারে কাছে কোথায় যেন সমুদ্রের একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটা দেখবার আগেই দৃশ্যটি হারিয়ে গেল।

এরকমই হয়। যোগে মানসনেত্রে যখন দিবালোকের মত কোন দৃশ্য ফুটে ওঠে, তখন প্রচণ্ড কৌতূহলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়, বিশ্লেষণ করে নেবার ইচ্ছা জাগে। অকস্মাৎ সেই মুহূর্তেই হয়তো দেখা গেল সিনেমার রিল কেটে যাবার মত দৃশ্যটি হারিয়ে যাচ্ছে। তখন হয়তো ভিন্নতর একটি wavelength ব্রেনে জাগ্রত হয়েছে, যার ফলে সেই গ্রহ বা দৃশ্যের wavelength-এর সঙ্গে তার মিল না হওয়াতে দৃশ্যটি কেটে যায়। সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখবার সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু দৃশ্যগুলি এত স্পষ্ট এবং এত ইমপ্রেসিভ

যে, স্মৃতি-স্নায়ুতে তা যেন স্থায়ী হয়ে বসে থাকে। স্মরণ করলেই ঠিক তদনুরূপ দৃশ্য নিয়ে ফুটে ওঠে।

পরে যখন এই নেকড়ের কথাটি লেখক চিন্তা করেছেন তখন তার এই হিংস্র মুখব্যাদানের কারণ বুঝবার জন্য নানাভাবে ভেবে দেখেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত একটি কারণই যথার্থ বলে তাঁর মনে হয়েছে। সে এই যে, নেকড়েটি তারই সূক্ষ্ম দেহকে ঊর্ধ্বে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল। একেই বলে সূক্ষ্মসত্তার অ্যাসট্রাল ট্র্যাভেল বা আকাশ পরিক্রমা।

কিছুদিন চলল যেন এই গ্রহ পরিক্রমাই। মহাশূন্যের বিরাট বৃত্তের কোন্ অংশে যে এই গ্রহগুলির অবস্থান কে জানে! সেখানে যে কি wavelength বিরাজ করছে তাই বা বলবে কে? মস্তিষ্কতরঙ্গের কোন্ কোন্ ফ্রিকোয়েন্সি যে তাদের সঙ্গে অকস্মাৎ যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে তা বলারও তো উপায় নেই, কারণ, কোন ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে সে ওয়েভলেংথ মাপবার জন্য তো কেউ অপেক্ষা করে না! এই গ্রহ পরিক্রমাকালে আর একদিন অকস্মাৎ আর একটি গ্রহের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এর আবহাওয়ামণ্ডলের চরিত্র ভিন্ন। অরণ্যানী রুক্ষ নয়, সবুজ, স্নিগ্ধ ও ঘন। বিশাল বিশাল মহীরুহ অন্তুত এক ক্ষীণ নীলবর্ণ আকাশের দিকে উঁকি দিয়েছে। আবহাওয়ার আর্দ্রতাও স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সমুদ্র এখনও এ গ্রহে বিশাল। তুলনায় মহাদেশ অত্যন্ত ছোট। সূক্ষ্ম সাদা ধোঁয়ার আড়ালে নীলাভ আকাশ বর্ষার কোন ইঙ্গিত না দিলেও বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে, আমাদের মৌসুমী বায়ু বাহিত বৃষ্টিপাতের চাইতেও বেশি বৃষ্টিপাত হয় এখানে। তাই অরণ্য প্রায় নিরন্ধ্র সবুজে ভরা। অরণ্যের খুব কাছ থেকে লেখকের চেতনা যেন উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করল। একটা খাঁড়ি গভীর অরণ্যের ভেতরে অনেকটা ঢুকে গেছে। বলা সম্ভব

নয় নিশাচর শ্বাপদেরা রাত্রিবেলা সেখানে জল খেতে আসে কি না। আসাটাই বরং স্বাভাবিক। কিন্তু অরণ্য ছাড়া প্রাণের অন্য কোনই চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। অকস্মাৎ এরই মধ্যে অরণ্যের অন্তর্নিহিত কোন একটি অঞ্চল সামান্য যেন নড়ে উঠল। হাওয়া নেই। সুতরাং কোন অরণ্যচরের গতিবিধির ফলেই হয়তো এটা হবে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে লেখক যেন অবাক হয়ে গেলেন। দীর্ঘ ও বিলম্বিত কালো কালো গাছের ডাল বেয়ে আশ্চর্যভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে একটি প্রাণী। অবিকল যেন মানুষ। লাঙ্গুল নেই। অথচ দুপায়ে হাঁটছে না। সামনের হাত ও পা দুদিকেই ভর করে গাছের ডালে ডালে চলাফেরা করছে। সমস্ত শরীর লোমে আবৃত,—রোমশ মানব। দেখতে দেখতে চোখের উপর আরও অনেক অনুরূপ প্রাণী ভেসে উঠল। তাহলে? লেখকের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এরা অদ্ভুত মানব আকৃতি বিশিষ্ট বৃক্ষচর। যে-কোন কারণেই হোক মাটিতে বসবাস করতে সাহস করে না। হয়তো শ্বাপদ বা সরীসৃপ শ্রেণীর আক্রমণের ভয় তীব্র—যাদের আকাশ পরিভ্রমণ কালে লেখক খুঁজে দেখবার অবকাশ পাচ্ছেন না। বৃক্ষের কাণ্ডে কোথাও হয়তো ঘরও বেঁধেছে এরা। সেটা অনুমান করা গেলেও দেখবার সময় পাওয়া গেল না। অবলীলাক্রমে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ডের উপর অনুরূপ বেশ কয়েকটি বৃক্ষচর রোমশ মানুষ একত্র জড় হয়ে কী একটা সভা জাতীয় কিছু করতে যাচ্ছে এটা দেখতে দেখতেই **wavelength**-এর লিংক্ কেটে গেল। মহাশূন্যের কোন সৌরমণ্ডলে মানুষের বিজ্ঞান-চিন্তার অতীত কোন্ মহাসমুদ্রে এই গ্রহকে জানে! সেখানে জীবন সভ্যতার কোন্ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে কে বলবে। কিন্তু অকস্মাতের দর্শন অকস্মাৎই হারিয়ে গেল। আবার কখনও সেই ওয়েভলেংথ হারিয়ে যাওয়া এই গ্রহটির সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে বলতে পারে!

অনন্ত আকাশের বুকে গণনাতীত কত অসংখ্য নক্ষত্র, নক্ষত্র ঘিরে কত গ্রহমণ্ডল, কত বিচিত্র প্রাণী আছে স্বয়ং স্রষ্টা ঈশ্বরও তার হদিস রাখতে পারেন কিনা কে জানে! অসংখ্য গ্রহের ফাঁকে আছে অসংখ্য অনন্ত আকাশ। ভারতীয় শাস্ত্রে যাকে 'অবকাশ' বলা হয়েছে। অসংখ্য অনন্ত আকাশ বলা হচ্ছে এই কারণে যে, কোন নক্ষত্রের আলোকবৃত্তের বাইরে সেই নক্ষত্রনির্ভর গ্রহমণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে বর্ণময় অঞ্চলই আকাশ, যে আকাশ দিনে নীলাভ হয়, ঘনঘোর মেঘের ফাঁকে বজ্রপাতঘটিত অট্টহাস্য করে, অঝোরে বৃষ্টি ঝরায়। আবার নিষ্কলঙ্ক নিশীথে অন্ধকারের পটভূমিতে অজস্র নক্ষত্রের হাসি ঝরিয়ে কোথাও বা এক কোথাও বা একাধিক উপগ্রহকে ঘুরপাক খাইয়ে মারে মূল গ্রহের চতুর্দিকে, যেন অনন্ত সপ্তপদী ঘোরাচ্ছে, এমনিভাবে। কিন্তু এর বাইরেও আছে অদ্ভুত ব্যাপ্তি। সেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারা কোন কিছুই নেই। ঋগ্বেদের ঋষি-কল্পিত সেই অন্ধকারের মত যা 'ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন।' সেই মহা নিরন্ধ্র অন্ধকার আকাশ নয়। মহাশূন্যতা-রূপ এক ব্যাপ্তি মাত্র। যার বুকে নীহারিকাপুঞ্জ ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছে। যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তলে অসংখ্য নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলী রচনা করে ফাঁকে ফাঁকে আকাশের জন্ম দিয়েছে। কখনও কখনও দুটি গ্রহের অন্তর্বর্তী এই আকাশ এতটাই বিশাল মনে হয় যে, তখন আকাশটাকেই অনন্ত বলে বোধ হয়। একদিন লেখক যোগকালে অকস্মাৎই বহুদূরে কোন নীহারিকাপুঞ্জের অন্তস্তলে কোন্ সূর্যের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যস্থলে, কোন্ আকাশে কে জানে, আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চমকে যান। সেখানে কোন পটভূমি নেই। নীল আকাশ নৈশ অন্ধকারে ঢাকা। তারই মধ্যে অদ্ভুত কিছু ছোট ছোট প্রাণী খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন এই আকাশই তাদের বাসস্থান। অক্লান্ত পাখায় ভর দিয়ে চিরকাল তারা এই আকাশের বুকেই বাস করছে। ছোট ছোট মানুষ। দেখতে শিশুর মত।

ছোট ছোট পাখাও আছে। যেন পরী! অসংখ্য পরী উড়ে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর সকল পুরাণ কাহিনীতে বোধহয় এদের কথাই বলা হয়েছে। এদের প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে লেখক যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাহলে পরীজাতীয় গল্প যে মিথ্যে নয় এ বিশ্বাসে লেখক দৃঢ়প্রত্যয় হলেন। তাঁর মনে হল, পরীর কল্পনাও বোধহয় ভারতীয় দেবদেবীদের মতই 'যোগীনাম ধ্যাননির্মিতম্'। 'মিথ' বলে যে কাহিনীকে মনে করা হয়েছে তা বোধহয় ইংরেজী ভাষার অর্থে 'Incredible' অর্থাৎ 'Mythological' নয়। মিথের পেছনেও কোন ধরনের সত্যতা নিশ্চয়ই ছিল, স্থূল বা সূক্ষ্ম যাই হোক না কেন।

মানবদেহের বিভিন্ন পর্যায় যা ষট্চক্রে ব্যক্ত হয়েছে, এবং কোষ নামে যাকে অভিহিত করা হয়েছে তার বিভিন্ন পরিধিতে স্থূল সূক্ষ্ম অদ্ভুত অদ্ভুত যে দর্শনীয় জিনিস, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখলে তা বিশ্বাস করাই প্রায় অসাধ্য। এই দৃষ্টি এখনও বস্তুবিজ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবিত কোন যন্ত্রের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। একমাত্র মানবদেহে শক্তিতরঙ্গ উত্থিত হলেই তা মস্তিষ্কের স্নায়ুতরঙ্গে ধরা পড়তে পারে। মনে রাখতে হবে যে, যন্ত্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে বড় হতে পারে না, কারণ, যন্ত্র মানুষ তৈরি করেনি, মানুষই যন্ত্র তৈরি করেছে।

জগতের নানা স্তরে নানা জিনিস আছে। কোথাও তা আছে দেশে (space) সূক্ষ্ম তরঙ্গ হিসাবে, কোথাও তা আছে আকাশের নানা গ্রহমণ্ডলীতে। এই জন্য যোগে মানসনেত্রে দর্শন দু'ধরনের—দেশজ (spatial) এবং গ্রহজ (planetorial)। স্তরে স্তরে দেশের নানা অবস্থা, যেমন দেশের প্রাথমিক অবস্থা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে, যার রঙ লাল। সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডল, যেখানে হাইড্রোজেন কণার পরিমাণ বেশি, যেখানে দেশের বর্ণ সবুজাভ। তার উপর সূক্ষ্মতর বায়ুমণ্ডলসমূহে কোথাও তা

সাদা, নীল, গভীরতর নীল ইত্যাদি। আজ্ঞাচক্র ভেদ করে কিছুদিন এই সব স্তরের তন্মাত্র পর্যায় পার হলে এক জ্যোতির্ময় আকাশ চোখে পড়ে। একে হয়তো Luminiferous ether বলা যেতে পারে। Luminiferous ether বলা হয় এই কারণে, যার মধ্য দিয়ে আলো যাতায়াত করতে পারে। এই ইথারতরঙ্গ চিৎ পর্যায়ে দর্পণসদৃশ আকার ধারণ করে। এর পরে মহাশূন্যতা। এই দেশের নানা পর্যায়ে নানা জিনিস দেখা যায়। একদিন লেখক ব্যোম তত্ত্বের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশুদ্ধ চক্রের সূক্ষ্ম আকাশ, যেখানে গভীর নীল রঙ থিতিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল এক অবস্থা ধারণ করেছে, সেখানে দেখতে পেলেন যেন কোন অপূর্ব রূপসী রমণী নৃত্য করছে। স্বর্গের উর্বশী বা রম্ভার চিন্তা এই ধরনের কোন দৃশ্য থেকেই ঋষিরা করেছিলেন কিনা তাই বা বলবে কে। যোগীর মানসনেত্রে এ হয়তো মনের প্রক্ষেপ হতে পারে। অপর পক্ষে তা কোন সূক্ষ্ম সত্তাও হতে পারে।

বর্তমান লেখকের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্থূল দেহই শেষ কথা নয়। তার উপরে আরও পাঁচটি বা ছয়টি সূক্ষ্ম দেহ আছে। মানুষের কামনা বাসনার ভার অনুযায়ী এই সূক্ষ্ম দেহগুলি দেশের নানা স্তরে অবস্থান করে। মানবদেহের চক্রের তরঙ্গশক্তির সঙ্গে সমতা রেখে ধোঁয়াকৃতি সূক্ষ্ম দেহ নানা পর্যায়ে অবস্থান করে। মানুষ কামনা বাসনামুক্ত না হতে পারলে সেই কামনা বাসনার আঘাতে পৃথিবীতে যেমন জর্জরিত হয়, সূক্ষ্ম দেহেও তেমনই জর্জরিত হয়। যে কামনা বাসনা মানুষকে আঘাত করে তা থেকে মুক্ত না হতে পারলে মরেও মানুষের শান্তি নেই। যে ব্যক্তি কামনা বাসনা দ্বারা তাড়িত নয়, দুঃখে সুখে সমানভাবে থাকতে পারে, তার ইহজগতেও যেমন কোন আঘাত নেই, মৃত্যুর পরেও তেমনই কোন যন্ত্রণা নেই। দৈহিক মৃত্যুর পর এই সব জীবের সূক্ষ্ম আত্মাই (অবশ্য কিছুটা উন্নতি হলে) চতুর্থ

স্থান থেকে অবস্থান করতে থাকে অর্থাৎ অনাহত পর্যায় থেকে অবস্থান করতে থাকে। সুতরাং দেশের চতুর্থ স্তরে যে আত্মা মৃত্যুর পর অবস্থান করে সেই আত্মা যখন যোগীদের ধ্যাননেত্রে ধরা পড়ে তাঁরা দেখেন যে, সেই আত্মাগুলি প্রশান্তভাবে অবস্থান করছে। এই জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম দেহগুলি সাধারণত ধোঁয়াকৃতি হলেও এদের মধ্যেও বর্ণ লুক্কায়িত থাকে। যাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাঁরা এই জীবাত্মার ধোঁয়াকৃতি দেহের মধ্যেও তার মৌলিক রঙ দেখতে পান। বৈজ্ঞানিকেরা এই ধোঁয়াকৃতি বস্তুটিকে ectoplasm নাম দিতে চান।

আত্মা যে পর্যায়ে প্রশান্তচিত্ত অবস্থায় থাকতে পারে সেই পর্যায়ই স্বর্গ পর্যায়। এই স্বর্গ পর্যায়েরও নানা অবস্থা আছে। চতুর্থ স্তরের আকাশে জীবাত্মা সাময়িক প্রশান্তি ভোগ করবার পর সুপ্ত কামনার ভারে পুনরায় ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির ধারার মত পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে মৃত্তিকাতে নেমে আসে। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলের আত্মাতে কামনা বাসনার পরিমাণ অতিরিক্ত কম থাকার জন্য সেখানে তাঁরা বেশিদিন অবস্থান করতে পারেন। ষষ্ঠ তলের আত্মারা সাধারণত নিজেদের ইচ্ছায় জগতের সংকটের কালে জীবদেহ ধারণ করে মর্ত্যে অবতরণ করে জীবের মঙ্গলের জন্য কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর বিখ্যাত সাধকদের এই স্তরে ধ্যানরত অবস্থায় ভাসমান দেখা যায়। এর উপরেও আর একটি অবস্থা আছে, যা দেখবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতা হল সপ্ততলে বিন্দুর মধ্যে ও প্রান্তদেশে। এঁদের দেহ জ্যোতির্ময় আলোর আকৃতি। বর্তমান লেখক বিন্দুর মধ্যে আলো-দেহে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দুই বাহু তুলে ঘুরতে দেখেছেন, এবং বিন্দুর প্রান্তদেশে স্ববর্ণ যিশুখ্রীষ্টকে জ্যোতির্ময় অবস্থায় দেখেছেন। কিন্তু দেশে (space) এই অবস্থা দেখা যত না চমকপ্রদ ভিন্ন গ্রহে জীবন্ত প্রাণী দেখা তার চাইতেও বেশী

চমকপ্রদ। কিন্তু ভিন্নগ্রহে যাবার আগে দেশে লেখকের আর কি কি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার দুএকটি বর্ণনা দিয়ে নেওয়া যাক।

চক্র ভেদ করে লেখক যখন একের পর এক দেহস্থ শক্তিকে ক্রম-উচ্চপর্যায়ে তুলে তীব্র তরঙ্গসম্পন্ন করছেন তখন অকস্মাৎ মস্তিষ্ক স্নায়ুতরঙ্গে আর একটি দৃশ্য দেখে চমকে যান। যেন অসংখ্য কোন রকেট ও বায়ুযান জাতীয় যন্ত্র অনবরত ছোটাছুটি করছে।

একদিন এই দেশেই লেখক দেখতে পান যে, জলে যেমন মানুষ সাঁতার কাটে তেমনই আশ্চর্য সব মনুষ্যাকৃতি জীব খেলে বেড়াচ্ছে। যেন মহাশূন্যের বুকে তারা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

শূন্যে ভাসমান এই সব আশ্চর্য ছবি দেখতে দেখতে অকস্মাৎ লেখক আর একদিন আর এক অদ্ভুত গ্রহের সঙ্গে চেতনাযুক্ত হয়ে যান। সে এক অদ্ভুত গ্রহ। আকাশে তার সকাল কি সন্ধ্যা বোঝার উপায় নেই। অথচ প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিস বলতে কিছু ধূসর মৃত্তিকা, হয়তো বা কাঁকর মেশানো। লেখক যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ জায়গা থেকে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তা বলা কষ্টকর। কোথাও কোন সমুদ্র ছিল কিনা বলার উপায় নেই। তবে একথা এখনও মনে পড়ে যে, নিবিড় এক অরণ্যের প্রান্তদেশ থেকে লেখক দৃশ্যটি দেখেছিলেন। ঊর্ধ্বে আকাশ ম্রিয়মানভাবে নীল। ঘন। অরণ্য কৃষ্ণাভ সবুজ বৃক্ষপত্রে এমন নিবিড়তা তৈরি করে আছে যে, অরণ্যের প্রান্তদেশ থেকে ভেতরে আর কিছুই তাকিয়ে দেখার উপায় নেই। কোন অদৃশ্য সুড়ঙ্গ থেকে অজস্র ঝিল্লি যেন করুণ একতারা বাজিয়ে চলেছে। এছাড়া চলমান জীবনের আর কোন স্পন্দন নেই। ঊর্ধ্বে কৃষ্ণাভ কিছু ধোঁয়াকৃতি মেঘ যেন স্থির হয়ে আছে। হাওয়াতেও কোন চাঞ্চল্য নেই। কোন পশু বা পাখি কারো সাড়া পাওয়া

যাচ্ছে না। আকাশে একটি পাখিরও ডানা নেই। অকস্মাৎ এমন সময় অরণ্যের বহুদূর প্রান্তে অদ্ভুত একটি জিনিসকে উঁকি মারতে দেখে লেখক যেন রীতিমত চমকে গেলেন। ত্রিতল বা চতুস্তল একটি গৃহের চিলেকোঠা। চিলেকোঠার জানালাটি এমনভাবে খোলা, যেন নিষ্পলক একটি চোখ পাতা খুলে তাকিয়ে আছে তো আছেই। অনেকক্ষণ অরণ্যশীর্ষ ভেদ করে সেই নিঃসঙ্গ চিলেকোঠাটি লেখক তাকিয়ে দেখলেন। যতক্ষণ দেখলেন ততক্ষণ কোন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে পারলেন না। যেন অব্যক্ত একটা হাহাকার নিস্তব্ধভাবে বয়ে যাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটির উপর দিয়ে।

এ কোন্ গ্রহ কে জানে! কিন্তু নীহারিকাপুঞ্জের যে অঞ্চলেই এর স্থান হোক না কেন। এখানে অচল প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেও সচল প্রাণের কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অথচ এখানে যে সচল প্রাণ ছিল নিঃসঙ্গ সেই চিলেকোঠাটিই তো তার প্রমাণ দিচ্ছে? চিলেকোঠাটি যখন দৃষ্টির সীমার মধ্যে পড়ছে তখন খুব দূরে নয় নিশ্চয়ই। সচল প্রাণের অস্তিত্ব থাকলে তার কোন কি প্রমাণ ততক্ষণেও পাওয়া যেত না? হয়তো বা এ গ্রহে কোনদিন অতি উন্নত সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে-কোন ভাবেই হোক এখানকার জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্ভবত কোন ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহেই ধ্বংস হয়েছে। এমন কোন বিষাক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল যার ফলে প্রাণিজগৎ নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেছে। তারপর হয়তো বহুদিন ধরে কোন একটি নগরের আশেপাশে তৃণগুল্ম গজাতে গজাতে বৃক্ষ হয়েছে, বৃক্ষ মহীরুহ আকারে দেখা দিয়েছে, তারপর নিষ্প্রাণ নগরীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে শুধুমাত্র গতিহীন প্রাণই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। সচল প্রাণের আর কোন অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র সচল বলতে কয়েকটি ঝিল্লি মাত্র আছে, তারাও কোন্ কোন্ সুড়ঙ্গে যে বাসা বেঁধে আছে কে জানে! বেদনা বিধুর

সেই দৃশ্যটি দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ চিন্তাতরঙ্গ সেই গ্রহটির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলল। লেখকেরও ধ্যান ভেঙে গেল। কিন্তু ধ্যান ভেঙে মানব-চেতনায় ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করতে লাগলেন। বিমর্ষ বোধ করতে লাগলেন এই ভেবে যে, পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে জগৎবিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি করে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাতে সামান্য একটু ভুলে যে-কোন সময়ই প্রলয়কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সমগ্র মানবসভ্যতাই তাতে হয়তো এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর মস্কো, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী কিছুই থাকবে না। ধীরে ধীরে প্রাণস্পন্দিত এইসব নগরীর চারধারে গজিয়ে উঠবে তৃণগুল্ম, তৃণগুল্ম থেকে গজাবে গাছ, গাছ থেকে হবে মহীরুহ, তারপর ঘন অরণ্য। তারপর অরণ্যের ফাঁকে একদিন এমনি করেই হয়তো উঁকি দেবে নিঃসঙ্গ একটি নিষ্পলক চিলে-কোঠা। পৃথিবীতে মানবসভ্যতার এই হয়তো শেষ পরিণাম। অবশ্য তাতে অনন্ত জগতের কিছুমাত্র এসে যাবে না। কারণ, বস্তু-বিজ্ঞান সন্ধান না পেলেও আন্তরজ্ঞান জানে যে, প্রাণিকুল লাঞ্ছিত এই ধরিত্রীই জগতের বুকে একমাত্র প্রাণিগ্রহ নয়। আরও অসংখ্য প্রাণিকুললাঞ্ছিত গ্রহ রয়েছে, যেখানে জীব অনেক বেশী প্রাণ-শক্তিতে স্পন্দিত, অনেক বেশী উন্নত, অনেক বেশী ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।

লেখক কোথায় আছেন নিজে বিচার করে বোঝা কষ্টকর। তথাপি তিনি বুঝতে পারছেন যে, গ্রহগ্রহান্তর পরিভ্রমণকালে নিশ্চিতরূপেই তিনি আকাশে অর্থাৎ ব্যোমে আছেন। বায়ুমণ্ডল সূর্যের নীল রঙ ধারণ করে বলে অনাহত মণ্ডলে তাকে নীলরূপে দেখা যায়। ব্যোম হল সূক্ষ্ম তন্মাত্র দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে ether বলা যেতে পারে। এই ইথারকে বলা হয়েছে **Luminiferous**, কারণ এর মধ্য দিয়ে আলো প্রবাহিত হতে

পারে। কিন্তু যোগে ষট্‌চক্র ভেদ কালে আকাশমণ্ডলে শুধুমাত্র গাঢ় নীলবর্ণই দৃষ্ট হয়। এই একটি রঙের এত প্রাধান্যের এখানে হেতু কি? তাহলে ব্যোমের যে সূক্ষ্ম অনুসত্তা (infra-Atomic existence) তাও কি অন্যকোন সূক্ষ্মজ্যোতির নীল অংশটুকুই ধরতে পারে মাত্র? এ-কথা নিশ্চিত সত্য যে, বায়ুমণ্ডল সূর্যের রঙ ধরলেও আকাশ ধরে না। বরং আকাশ গ্রহ, সূর্য, অন্যান্য নক্ষত্র ইত্যাদিকে ধরে আছে। আকাশ এই জন্য জননী হিসেবে কল্পিত। তন্ত্রে এই জন্য বলা হয়েছে, '৺কালী রমণী ৺তারা জননী।' ৺কালী, মানে আদিশক্তি (primordial energy) যা শূন্য থেকে প্রথম ছুটে বেরিয়ে এসে সময়ের সূচনা করে। সেই ৺কালীরূপা শক্তি যখন বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন অসংখ্য উজ্জ্বল অগ্নিপিণ্ড (নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি) যার বুকে স্থান লাভ করে তার নাম ব্যোম। এই ব্যোমের বর্ণ নীল। সম্ভবত মূল জ্যোতির নীল অংশ এতে বেশি করে প্রকটিত বলেই এর বর্ণ নীল। এই ব্যোমই তান্ত্রিকদের কাছে ৺তারারূপে চিহ্নিত '(হ্রীং' মন্ত্র দিয়ে বোধহয় এই আকাশ তত্ত্বের শক্তি ৺তারাকেই আরাধনা করা হয় (হ=ব্যোম, ঈ=গতি (শক্তি)=আকাশ-শক্তি।)। এই ৺তারার বর্ণ সেই কারণেই তাঁরা নীল করেছেন। এই ব্যোম বা ৺তারা নিজের বুকে মায়ের মত জগৎ ধারণ করে আছেন বলেই তিনি জননী, এবং শূন্যের বুকে স্বভাবে ফুটে উঠে শূন্যের সঙ্গে অভিঘাতে (রমণক্রিয়ায়) লিপ্ত হয়েছিলেন বলেই ৺কালী (primodial energy) হলেন রমণী।

এই ব্যোমে যে বিভিন্ন সৌরমণ্ডলে গ্রহগ্রহান্তর আছে, যোগ সাধনার পঞ্চম পর্যায়ে লেখকের তৃতীয় নয়নে সেই প্রাণিসঙ্কুল গ্রহগুলিই দর্শনের মধ্যে আসছিল। প্রথম প্রথম এই গ্রহ এবং গ্রহের আবহাওয়ামণ্ডলীতে লেখক অকস্মাৎ ঢুকে গিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখছিলেন। এবার সেই দর্শন যেন একটু

ভিন্নতর হতে লাগল। অকস্মাৎ ধ্যানস্থ হতে হতে লেখকের মনে হত তিনি যেন কোথায় এক উপসাগরের পথে কোন মহাদেশের অরণ্যসংকুল প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মাঝে মাঝে সেই অরণ্যপ্রান্ত অদ্ভুতভাবে যেন ফাঁক হয়ে যেত। তারপর দুই পাশে বৃক্ষের সারি বাঁধা বহুদূর প্রসারিত দীর্ঘ পথ চোখে পড়ত তাঁর। যেন কেউ পথের দুই ধারে অসংখ্য পাম-ট্রি বসিয়ে রেখেছে। বানিহাল থেকে শ্রীনগর সড়কে প্রবেশ করলে শ্রীনগর শহর পর্যন্ত যে ধরনের বৃক্ষশোভিত এভিনিউ টাইপের পথ দেখা যায়, এ যেন দেখতে ঠিক সেই ধরনের। বহু দিন বহু অজানা গ্রহে এইভাবে লেখকের চৈতন্যসত্তা বিচরণ করেছে। এক একটি গ্রহের এক এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি আছে। কোনটির শক্তিতরঙ্গ এত বেশি যে, তাতে প্রবেশই করা যায় না। উপসাগরীয় কূলের অরণ্যপ্রান্ত থেকেই ফিরে আসতে হয়। আবার কোথাও কোথাও এভিনিউসদৃশ দীর্ঘপথে চৈতন্যকে ছুটিয়ে কোথাও যেন এর শেষ না পেয়ে ফিরে আসতে হয়। উপ-সাগরীয় অরণ্যপ্রান্ত দিয়ে এভিনিউসদৃশ পথে এগুতে গিয়ে লেখক প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন নি। তবে একদিন অকস্মাৎ তিনি অদ্ভুতভাবে মুহূর্ত কালের জন্য একটি দৃশ্য দেখতে পেয়ে রীতিমত চমকে যান। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র ; ভাল করে কিছু দেখার আগেই দৃশ্যটি হারিয়ে যায়। দৃশ্যটি এই :—বিরাট এক হল ঘর। তাতে বহু মানুষ সারি বেঁধে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আসনে বসে আছে। যেন কোন সভাগৃহ। লোকগুলোর পোশাক-আশাক পুরনো বা আধুনিক, কি ধরনের হতে পারে ভাল করে দেখতে গিয়েই সব যেন হারিয়ে গেল। তবে একটি কথা লেখকের স্পষ্ট মনে আছে যে, তাদের প্রত্যেকেরই মাথায় উষ্ণীষ ছিল। এই দৃশ্য মুহূর্তকালের জন্য লেখকের চোখের উপর থাকলেও একটি ধারণা করবার তাঁর অবসর

হয়েছিল, তা এই যে, এই সভাগৃহ উন্নত কোন প্রাণীর—যাঁদেরই আমাদের দেশে দেবতা বলা হয়। আসলে এসভা হল দেবসভা।

এই দেবসভা গ্রহের পরে আর একদিন অকস্মাৎ এমন একটি গ্রহে গিয়ে লেখকের সূক্ষ্মসত্তা অর্থাৎ মস্তিষ্ক-স্নায়ু-তরঙ্গ গিয়ে উপস্থিত হয় যে, সেখানে আশ্চর্য একটি দৃশ্য দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। দৃশ্যটি এই ঃ—সারি সারি স্ফটিকের আসন পাতা। তার উপর বসে রয়েছে কতকগুলি সিংহ। দৃশ্যটি দেবসভা-গ্রহের দৃশ্য অপেক্ষাও বেশি সময় লেখকের মানসনেত্রে ছিল। লেখকের চিন্তাতরঙ্গ তখন ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছিল, এখানে এমনভাবে সিংহ কেন? এমনভাবে সিংহগুলি বসে আছে দেখেই বোঝা যায় যে, এগুলি পোষ্য। কিন্তু কারা? কেনই বা তাঁরা এই সিংহগুলিকে পুষছেন? সিংহকে কি তাঁরা বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন? এই গ্রহেই কি সাধকেরা সিংহবাহিনী কোন দেবীর দর্শন পেয়ে সিংহবাহিনী দেবীমূর্তির কল্পনা করেছিলেন? শুধু ভারতীয়েরা কেন, হিত্তি, মেসোপোটেমীয়, নানা জাতিই হয়তো এই ধরনের দৃশ্য দেখেই সিংহবাহিনী দেবীর কল্পনা করেছিলেন।

স্ফটিক আসনে সিংহ দর্শনের পরই লেখক বোধহয় ভিন্ন গ্রহে তাঁর জীবনের সর্বোত্তম দর্শনীয় দৃশ্য দেখেন। লেখক ধ্যানে আছেন। অকস্মাৎ তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠল একটা গোল পরিমণ্ডলের উপর অদ্ভুত এক দৃশ্য। ধূসর ন্যাড়া পাহাড়। তাঁর পাদদেশে একখণ্ড শিলার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনবদ্য সুন্দরী এক রমণী। মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তা কোথায়, বুঝে ওঠার আগেই যেন দৃশ্যের উপর অকস্মাৎ যবনিকা-পাত হল, অর্থাৎ দৃশ্য কেটে গেল। গ্রীক কল্পনার ভিনাস ও আফ্রোদাইতও বোধহয় এত সুন্দরী নন। দুগ্ধফেননিভ (Milky white) দেহ। কমনীয়তায় যেন রজনী গন্ধাকেও

হার মানিয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটি হারিয়ে গেলেও সেই অপূর্ব দিব্যসৌন্দর্যের স্পন্দন লেখককে পরদিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এর তুলনায় বেশী সুন্দরী— পৃথিবীতে এমন অন্য কোন সৌন্দর্যের রূপরেখা চিন্তা করা বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু লেখকের সেই চিন্তা যেন পরদিনই ধ্যানে বসে লজ্জায় মিলিয়ে গেল। লেখক যোগবায়ুবলে চেতনাকে মধ্যস্তরে ওঠানো মাত্র দেশে (Space) অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখলেন। লেখক দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে নবদূর্বাদলশ্যাম এক পরম রমণীয় নারীমুখ ভেসে উঠেছে। শুধুমাত্রই মুখ। সমগ্র মুখমণ্ডল রমণীয় নানা রত্নরাজিতে নর্তকী রূপে সুসজ্জিতা। লেখকের বুঝতে কেন যেন এতটুকু অসুবিধা হল না যে, এ হল মহামায়া, স্বয়ং ৺মা কালীর মুখ। লেখকের সৌন্দর্য-চেতনাকে বিদ্রূপ করার জন্যই যেন সামনে এসে দেখা দিয়েছেন। লেখকের ধ্যান ভেঙে গেল। স্মৃতি-তরঙ্গে শুধু সেই অপূর্ব রমণী-মুখটিই ভেসে উঠতে লাগল। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৌন্দর্য যেন শ্যামল স্নিগ্ধতায় এই নর্তকীরূপা মাতৃমুখে ধরা পড়েছে। এরপরই বোধ হয় ভিন্নগ্রহে লেখকের সর্বাপেক্ষা বেশী জীবন্ত ভয়ঙ্করী এক রূপ চোখে পড়ে। বোধহয় আজ্ঞাচক্রের প্রান্তদেশে তখন লেখকের চেতনা ঘোরাফেরা করছে, ঠিক তখনি একদিন অকস্মাৎ সমস্ত রঙ ছিঁড়েখুঁড়ে নতুন একটি গ্রহের বিশেষ একটি অংশ লেখকের চোখের উপর ভেসে উঠল। পশ্চাৎপটে রয়েছে সেই শিবানী-পর্বতের মত ন্যাড়া পাহাড়। কিন্তু সে পাহাড় সমুদ্রের ধারে। আকাশের মত নীল সমুদ্র-বারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় এবং নীল সাগরের মাঝখানে রয়েছে স্বর্ণ-বালুকণা। তার উপর দিয়ে ভয়ঙ্কর তেজসম্পন্না এক কালো খর্বকায় মূর্তি হেঁটে যাচ্ছে। উলঙ্গ। অন্ধকারের মত কৃষ্ণবর্ণ তাঁর সেই উলঙ্গ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে না।

কিন্তু তার পদযুগল, জঙ্ঘাদ্বয়, হস্ত ও বাহুদ্বয়ে অদ্ভুত হলুদ রঙ বালার মত করে জড়ানো। একটু কাৎ হয়ে হাঁটছিলেন তিনি। মুখমণ্ডলের গণ্ডদেশেও হলুদের ছাপ রয়েছে। মস্তকের তুঙ্গ-স্থান কিসের ছায়াতে যেন আড়াল হয়ে রয়েছে। স্বর্ণ বালুকণার উপর দিয়ে সেই ভয়ঙ্করী মূর্তিটি এত দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে যে, তাঁর তেজ-তরঙ্গে লেখকের হৃৎপিণ্ড যেন বুকের পিঞ্জর ভেদ করে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। এই দৃশ্য দেখে লেখক ভয়ঙ্করভাবে চমকিত হতে যাবেন এমন সময় অকস্মাৎ সে দৃশ্য-টিও হারিয়ে গেল। কিন্তু এদৃশ্যগুলো যতই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, এত impressive যে, একবার দেখা গেলে বিস্তৃতির অন্তরালে কখনও তলিয়ে যাবার নয়। সেই জন্যই লেখক স্মৃতির পাতা খুলে বহুদিন পরেও তাঁর সেই অভিজ্ঞতাগুলির কথা হুবহু মনে করে লিখতে পারছেন। সেই ভয়ঙ্কর কালো মূর্তিটি যে ৺কালীমূর্তি, সে বিষয়ে লেখকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে দ্বিহস্ত দ্বিপদযুক্ত। লেখকের এত দিন ধারণা ছিল যে, ৺কালীমূর্তি তত্ত্বমূর্তি, এবার ধারণা হল, না, তাঁর রক্তমাংসের সত্য মূর্তিও আছে। ভারতীয় শক্তি-সাধকেরা এই রক্তমাংসের নানা শক্তিমূর্তি দেখেই বোধহয় নানা রূপে ৺মায়ের কল্পনা করেছিলেন, এবং তাতে তাঁদের দিব্য ভাবব্যঞ্জনা দেবার জন্য সত্যের উপর শিল্পের ছোঁয়া দিয়ে চতুর্ভুজ মাতৃমূর্তি কল্পনা করেছিলেন।

এই ভয়ঙ্করী ৺কালীমূর্তি দেখার পরই বোধহয় লেখকের গ্রহ দর্শন পর্যায় শেষ হয়েছিল। এর পর তাঁর যা চোখে পড়েছে তা শনিগ্রহের আকৃতিবিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান অগ্নিগোলক ছাড়া আর কিছুই নয়। একেই লেখক বলেন বিন্দু। যা শূন্য থেকে বিন্দুরূপে ফুটে উঠে ঘূর্ণায়মান হতে গিয়ে প্রথম দিকে দেখতে শনিগ্রহের মত হয়েছিল। পরে সেই শনিগ্রহের কেন্দ্রস্থল

অর্থাৎ শূন্যতারূপ অক্ষ শিবলিঙ্গের মত ফুটে উঠে বিন্দুকে শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টের রূপদান করেছিল। সেই শিবলিঙ্গই জগৎরূপে অর্থৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে ফুটে উঠেছে।

ছয়

গভীর নীল ক্রমশ যেন হাল্কা হচ্ছে। অতলান্ত সেই গভীর নীলের বুকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের ছায়ার মত যে ছায়া চোখে পড়ছিল তাও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ভ্রূমধ্যস্থ পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের অঞ্চলটুকু যেন ফুলে ফেঁপে উঠে ফেটে যেতে চাইছে। অকস্মাৎ নীল হারিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝেই লেখক অদ্ভুত এক আলোর জগতে গিয়ে পড়ছেন। অনেকক্ষণ যেন সব কিছুই আলোকিত হয়ে থাকছে। ভাবখানা এই যে, যেন চল্লিশ ওয়াটের কোন বাল্‌বের নিচে বসে আছেন তিনি। অন্ধকার গভীর নিশীথে অকস্মাৎ ঘরে আলো জেবলে দিল কে, ভেবে মাঝে মাঝে ভ্রান্তি-বশত চোখ খুলে দেখছেন কোথাও আলো নেই। তা হলে এ আলো আসছে কোথা থেকে? শক্তি পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডে উঠে কি আলোতরঙ্গ সৃষ্টি করছে? প্রাচীনরা এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডকে মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতেন। মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিচুতলার জীব, যেমন মাছ ও ব্যাঙ, এদের ক্ষেত্রে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড চোখের মত আলোগ্রাহী এক ধরনের কাঠামো তৈরী করে। উন্নত স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের আলোগ্রাহী ক্ষমতা নাকি চলে গেছে। বিজ্ঞান পরীক্ষা করে দেখেছে যে, পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড না থাকলে অন্ধকার মানুষের কাছে অন্ধকার রূপেই থেকে যায়। পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড থাকলে অনেক সময় চোখ বুজেও মানুষের দর্শন হতে পারে। তাহলে এই

পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডই কি মানুষের তৃতীয় নয়ন ! এই যে ধ্যানে চোখ বুজে লেখক এত কিছু দেখছেন, একি পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবের জন্যই ? এই জন্যই কি ধ্যানে বসলে ভ্রূমধ্যস্থ অংশে এক ধরনের শক্তি ফুলে উঠতে চায় ? আজ্ঞাচক্রের অঞ্চলে এই গ্ল্যাণ্ডে কি লেখকের কুলকুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বগামী হয়ে প্রচণ্ড তরঙ্গ সৃষ্টি করছে, যে জন্য দৃশ্যের পরিবর্তে লেখক এখন পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড বিচ্ছুরিত কেবল মাত্র আলোই দেখতে পাচ্ছেন ? কিন্তু লেখকের ধারণা, তৃতীয় নয়ন মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী নিয়েই। শক্তি তরঙ্গে যে পর্যায়ে তার তরঙ্গ ওঠে সেই পর্যায়ের সব কিছুই চোখ মেলে না থাকলেও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। একথা তো সত্য যে, আমাদের বাইরের চোখই দেখে না, মস্তিষ্ক স্নায়ুতে যদি দৃষ্টি-কোষ না থাকে তা হলে চোখ থাকতেও লোক অন্ধ প্রতীয়-মান হবেন। দেখার মূল কেন্দ্র রয়েছে মস্তিষ্ক-স্নায়ুতে বা মস্তিষ্কের ভেতর দৃষ্টিকোষে (Visual nerve)।

সে যাই হোক, লেখক তখন দেহস্তরের আরেক পর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন—যাকে বলা যায় আলো পর্যায়। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বায়ু শক্তিরূপে মুহূর্তের মধ্যেই ঊর্ধ্বে উঠে ভ্রূমধ্যস্থ অংশে হানা দিচ্ছে। সেখানেই যে স্থির হয়ে থাকছে তা নয়, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও তা যেন প্রবেশ করছে। মস্তিষ্ককে মনে হচ্ছে একটি ব্লাডার। কেউ একটি বাল্‌ব জ্বালিয়ে দিলে যেমন নিষ্কম্প আলো জ্বলতে থাকে তেমনি একটা স্থির আলো যেন জ্বলে উঠছে। লেখকের মনে হচ্ছে তিনি একটা বাল্‌বের নিচে বসে আছেন। মস্তিষ্কের ঊর্ধ্ব অংশে বায়ুর উপস্থিতিটা বেশি বোধ হলে আলো যেন ক্রমশ ফ্লোরেসেণ্ট হচ্ছে। তখন কেমন একটা স্নিগ্ধতা বোধ করা যাচ্ছে।

আলোর জগতে প্রবেশ করার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন লেখকের যেন মনে হল, পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড এক

বিস্ফোরণ ঘটে গেল। অজস্র বর্ণবাহার ফুটে উঠল—লাল, নীল হলুদ, বেগুনি. নানা রকম। তারপরই চোখের পাতা দুটো পরস্পর চাপ সৃষ্টি করে মুদে এলে চোখের উপর মাকড়শার জালের মত অদ্ভুত একটা জাল ফুটে উঠল, যে জাল লেখকের মতে সহস্রারের চিত্র। যা দেখেই যোগীরা সহস্রারের কল্পনা করে-ছিলেন। কিন্তু কোন এক ইউরোপীয় লেখক গোলাকৃতি এরকম একটা জাল সৃষ্টি করে তাকে আজ্ঞাচক্র হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।
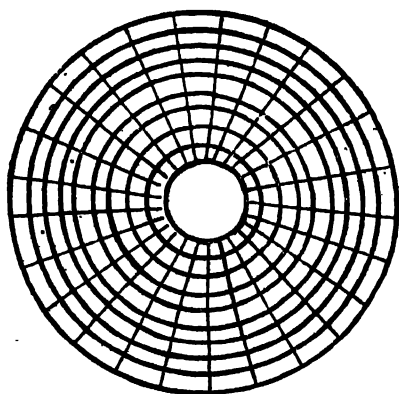
লিডবিটারের চক্র
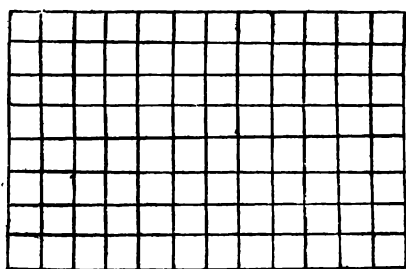
এই জাল যোগের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই মুদ্রিত চোখের পাতার উপর একটু চাপ পড়লেই দেখা যায়, অর্থাৎ শক্তিতরঙ্গ দেহের মধ্যাকাশে উঠলে চোখের পাতায় চাপ পড়লে তবেই দেখা যায়।

সমুদ্রের জাল

কিন্তু আজ্ঞাচক্র পর্যায়ে এই শক্তিতরঙ্গ উঠে এই জাল সৃষ্টি করবার পর আবার ছয়টি চক্রে দেখা বিভিন্ন চক্রবর্ণের তন্মাত্রস্বরূপ চোখে পড়ে। তার পরই অদ্ভুত স্বচ্ছ ছায়ার জগৎ ফুটে ওঠে। অবশ্য এই স্বচ্ছতা জলের স্বচ্ছতার মত, দর্পণের স্বচ্ছতার মত নয়।

প্রকৃত পক্ষে যাঁরা বিন্দুধ্যান করে আসনে বসেন তাঁরা

কিছুদিন পরেই মানসচেতনাতে একটা ভাসমান অবস্থা অনুভব করেন। যেন কোন অকূল পারাবারে দেহ ভাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে। স্থূল সৃষ্টি বাদে এবং নিস্তব্ধ শূন্যতা বাদে সমগ্র দেশটাই একটা কূলকিনারাহীন সমুদ্রসদৃশ। এই সমুদ্র থেকেই যেন সৃষ্টি ফুটে উঠছে। বস্তুত বিজ্ঞানীরাও এই দেশে পুঞ্জ পুঞ্জ হাইড্রোজেন-কণা জমতে দেখতে পেয়েছেন। এই ব্যোমরূপ সমুদ্রেই সৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। জলে যেমন পদ্ম ফোটে সৃষ্টিও তেমনই অযোনিসম্ভব। এই সৃষ্টির সক্রিয় কর্তা, পালনকারী, ঐশ্বর্যদায়িনী শক্তি, বিদ্যা, প্রভৃতিও স্বয়ম্ভূ, পদ্ম থেকে প্রকাশিত, ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সেরকমই কল্পনা করেছেন। ব্যোম-সলিলে এই জন্য পদ্মের উপর নানা দেবদেবীর মূর্তি তাঁরা স্থাপন করেছেন, যেমন বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি।

লেখক যখন আজ্ঞাচক্র ভেদ করে এক সময় এই তরল স্বচ্ছতার স্তরে গিয়ে উপস্থিত হন তখন সেই স্বচ্ছতার মধ্যে অদ্ভুত কয়েকটি ছবি ও ছায়াছবি দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। যেমন একদিন অকস্মাৎ তাঁর চোখের উপর ফুটে ওঠে একটি বৃত্ত। সেই বৃত্তের মধ্যে জ্যোতির্ময় এক বৃষমুখ উঁকি দেয়। তার শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে যেন জ্বলন্ত ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে! লেখক ভেবে অবাক হয়ে যান যে, এদৃশ্য তাঁর মানসনেত্রে ভেসে উঠবে কেন? এ যে তাঁর মনের প্রতিফলন হবে সেরকম হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। নেই এই কারণে যে, ভারতীয় যত পুরাণ-কাহিনী তিনি পড়েছেন তার মধ্যে ষণ্ডমস্তিষ্কের এমন কোন কল্পনা নেই। তাছাড়া নিজেও তিনি ষাঁড়ের কথা কখনও ভাবেন না। তাহলে অদ্ভুত এই দৃশ্য তিনি দেখলেন কেন? ষাঁড়েরও কি কোন দৈবী অস্তিত্ব আছে? এই জন্যই কি শিবের সঙ্গে ষাঁড়কে যুক্ত করা হয়েছে? এই জন্যই কি প্রাগার্য সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহরে কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের এত ছড়াছড়ি? পরে অবশ্য লেখক পৃথিবীর

অধ্যাত্ম সাধনা সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, প্রাচীন মেসোপোটেমীয়রা ষাঁড়কে মহান দেবতারূপে কল্পনা করে পুজো করতেন। এই জন্যই দৈত্যরা তাঁদের উষ্ণীষে দৈবশক্তি বোঝাবার জন্য ষণ্ডশৃঙ্গ ব্যবহার করতেন। জীবজগতের রহস্য যে কত অতল গভীর, সহজে এক কথায় তা ব্যাখ্যা করার উপায় নেই। ইদানীং মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগৎ ক্রমবিকাশের নামে রক্তকণিকায়, জিনে, সেই আদিমতম চিন্তার সূত্র ধরে রাখতে পারে। এবং তাই কখনও স্বপ্নের আকারে মানসচক্ষে ফুটে উঠে তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। তাহলে কি লেখক ধ্যানে যে ষণ্ডমুণ্ড দেখেছিলেন তা তার আদিমতম উত্তরাধিকার? এক সময় তিনি মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসী ছিলেন? কিংবা একসময় প্রাচীন মেসোপোটেমীয়রা ধ্যানে যে মূর্তি দেখে তাকে 'মহান দেবতার' আসনে বসিয়েছিলেন পাঁচ হাজার বছর পরে লেখকও ধ্যানে সেই একই দৃশ্য দেখেছেন? ধ্যানজগতে দৃষ্ট নানা পশুই কি তাহলে প্রাচীন উপজাতীয়দের অভিজ্ঞান বা Totem হিসেবে কাজ করেছে?

লেখক সেই ষণ্ডমুণ্ডের রহস্য ভেদ করতে যখন ব্যস্ত ইতিমধ্যে তিনি সেই স্বচ্ছ ছায়া ছায়া তরল অবস্হাতে আর একটি চিত্র ভেসে উঠতে দেখে যেন রীতিমত চমকিত বোধ করলেন। পুরীর সমুদ্র-দিগন্তে উঠি উঠি করতে করতে সূর্য যেমন একসময় হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, সেই ছায়াছবিটিও যেন তেমনই ছায়া ছায়া একটি ভাব সৃষ্টি করতে করতে ভেসে উঠল। লেখক দেখলেন, তরল ছায়া-স্বচ্ছতার নিচে আর একটি ছায়া যেন ফুটি ফুটি করে কাঁপছে। অকস্মাৎ সেই ছায়া যেন স্পষ্ট হয়ে শিলুয়েটের মত ছায়ামূর্তি ধরে উঠে দাঁড়াল। লেখক দেখলেন, প্রথম ফুটল একটি পদ্ম। তারপর ধীরে ধীরে সেই পদ্মের উপর চতুর্ভুজ ছায়ামূর্তি নারায়ণ। লেখক অনেকক্ষণ ভেবে ঠিকই করতে

পারলেন না যে, তিনি কি দেখছেন? একি তাঁর পুরাণপাঠজনিত মানসপ্রতিফলন, না ষণ্ডমুণ্ডের মত এও কোন যথার্থ সূক্ষ্ম সত্তা যা দেখেই ভারতীয় ঋষিরা চতুর্ভুজ নারায়ণের কল্পনা করেছিলেন? ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত এই নতুন রহস্যের কোন অর্থই যেন ভেদ করতে পারলেন না তিনি। অথচ লেখক নিজের মানসিকতায় যতটা মাতৃভক্ত অর্থাৎ শক্তিভক্ত ততটা নারায়ণ বা বিষ্ণুভক্ত নন। বরং বৈষ্ণবদের সম্পর্কে তাঁর কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। বৈষ্ণব বিনয়ভাব তাঁর মোটেও মনের মত নয়। সুতরাং তাঁর মানসনেত্রে বিষ্ণুর ছবি ফুটে উঠবে কেন তা তিনি ভেবে পেলেন না। পরে অবশ্য এর একটা অন্তর্নিহিত রহস্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। এরও নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে। দিব্য সাধনমার্গে যাঁরা না গিয়েছেন, তাঁরা হয়তো এটা বুঝতে পারবেন না।

এই বিষ্ণুমূর্তি দেখবার কিছুদিন পরে লেখক অনুরূপভাবে সেই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ তরল ছায়ার বুকে আর একটি ছায়াছবি ভেসে উঠতে দেখলেন—সে ছবি সরস্বতীর। অথচ ভারতীয় ত্রয়ী মূর্তি অনুসারে, যদি পুরাণশাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী মানসক্ষেত্রে কোন চিত্র ভেসে ওঠে, তাহলে সে চিত্র হওয়া উচিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের। কিন্তু আশ্চর্য! চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পরে তাঁর শক্তি হিসেবে লক্ষ্মীমূর্তিকেও না দেখে লেখক দেখলেন সরস্বতীর মূর্তি। কেন? পরে এর অর্থ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সক্রিয় সৃষ্টি আরম্ভ হয় বিষ্ণু থেকে। তারই উপরে রয়েছে বিদ্যা—যাকে বলা যেতে পারে পরাবিদ্যা। এই জন্য বিষ্ণুর পরেই ছায়াপদ্মে এক সময় ভেসে উঠল সরস্বতী। ধ্যানমার্গে বিদ্যা বা জ্ঞানচক্ষু না খুললে যথার্থ দিব্যজগতের স্বরূপ দর্শন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বেশ কিছু দিন এই ছায়া সরস্বতী মূর্তি লেখকের চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল। তারপরই আবার

সেই সীমাহীন বিস্তৃত স্বচ্ছ ছায়ার জগৎ। সেই ছায়া জগতে যখন ভাসমান হচ্ছেন তখন অকস্মাৎ আর একদিন লেখকের চোখের উপর ভেসে উঠল আর একটি ছায়ামূর্তি। এ মূর্তি লক্ষ্মীর। সরস্বতীর পরেই লক্ষ্মীমূর্তি কেন, লেখক ভাবতে লাগলেন। তাঁর গভীরতম সত্তা থেকে তখন এর যেন একটা ব্যাখ্যা ভেসে আসতে লাগল। পরাবিদ্যারও উপরে স্থান পরম ঐশ্বর্যের। ঈশ্বরের পরম ঐশ্বর্য প্রকাশিত হবার পরই পরাবিদ্যার জন্ম। এই ঐশ্বর্যই হল তাঁর বর্ণতরঙ্গ, যা থেকে সৃষ্টির সূত্রপাত। সৃষ্টির আদি তরঙ্গের পরে থাকে সূক্ষ্ম বোধ। সেইই হল পরাবিদ্যা, তাই লক্ষ্মীর নিচে সরস্বতী। বিদ্যা সৃষ্টির তরঙ্গে স্থূল বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার প্রথম ধাপ। তারপরই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়ে ব্যোমে অর্থাৎ space-এ পালনকর্তা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে আসে। সেইজন্য বিষ্ণুর রঙ নীল। 'বিন্' অর্থাৎ আকাশ এই তামিল শব্দ থেকে সেই জন্যই বিষ্ণু শব্দের উদ্ভব, যিনিই চতুর্ভুজ নারায়ণ। যে জন্য বিদ্যারও নিচে লেখক তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের পরম ঐশ্বর্য মানসনেত্রে খুলে গেলে তবেই সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে বোধ জন্মে।

ছায়া-সূক্ষ্ম তরল জগতে এইভাবে লেখকের যখন নানা দর্শন হচ্ছে, তখন একদিন অকস্মাৎ ছায়াছবি মুছে গিয়ে স্ববর্ণে আর এক মূর্তি লেখকের মানসনেত্রে ধরা পড়ল। এই মূর্তি হল সিদ্ধিদাতা গণেশের। সমগ্র দেহ রক্তময়। পরনে শ্বেত পোশাক। মস্তিষ্ক শ্বেত হস্তীর। এমন স্ববর্ণ এক মূর্তি লেখক এই অঞ্চলে দেখতে পাবেন তা ভাবতেই পারেননি। তিনি রীতিমত চমকিত হলেন এবং আনন্দ বোধ করলেন এই ভেবে যে, গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। নিশ্চয়ই এবার তাঁর সর্বকর্মে সিদ্ধি আসবে। সুতরাং ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলেও সেই পুলকের ছন্দে তিনি স্পন্দিত হতে লাগলেন।

কিন্তু গণেশ দর্শনের পরিণাম হাতে হাতে পেলেন লেখক পরের দিনই। তাঁর একটি হওয়া কাজ ভেস্তে গেল। এবং তিনি মনে মনে এতটাই ক্ষুব্ধ হলেন যে, গণেশ মূর্তির উপরই রীতিমত চটে গেলেন। ভাবলেন, এ হল মূর্তিমান অসিদ্ধিদাতা। বাড়িতে একটি গণেশের মূর্তি আঁকা ক্যালেণ্ডার ছিল, তিনি রাগ করে দেয়াল থেকে সেই ক্যালেণ্ডারটি পর্যন্ত সরিয়ে ফেললেন। কিন্তু তখন যোগের এক স্রোতাবর্তে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি। নদীতে ঘূর্ণিস্রোতের টানে পড়লে যেমন নৌকা ডুবে যায়, কিছুতেই উদ্ধার পায় না তেমনি যেন অধ্যাত্ম সত্তার প্রবল এক ঘূর্ণিপাকে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। ফলে গণেশের উপর ক্রুদ্ধ হলেও যোগ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন না তিনি।

যোগ চলছে। ছায়া ছায়া তরল সূক্ষ্ম জগৎ আবার ক্রমশ আলোকিত হয়ে উঠছে। এখন আর কোন গ্রহ নয়, গ্রহান্তর নয়, নির্মীয়মান কোন অগ্নিগোলক গ্রহও নয়, এখন অদ্ভুত এক তরল আলোর বন্যায় যেন ভেসে যেতে লাগলেন লেখক। মাঝে মাঝে অনন্তে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে গিয়ে আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। সূর্যের সাতরঙও যেন এক এক করে মাঝে মাঝেই সামনে এসে দাঁড়ায়, আবার চলে যায়। এক অদ্ভুত ধরনের দিব্যজগৎ যেন লেখকের চোখের উপর তখন ভেসে উঠছে। এরই মধ্যে একদিন লেখক সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে গেলেন ভিন্ন আর একটি দৃশ্য দেখে। সামনের দিকে, লেখকের ভ্রূযুগলের ঊর্ধ্বে কোন এক স্থানে মহাকাশে উজ্জ্বল একটি মুখ ভেসে উঠল। মুখটি ত্রিকোণাকৃতি। কালীঘাটের ৺কালীর মত মুখ। তার চার দিক থেকে তীব্র জ্যোতি বিকিরিত হচ্ছে। আর কে যেন লেখকের মনের অন্তস্তল থেকে বলছে, এই হল মাহেশ্বরী মূর্তি, তন্ত্রের কামকলা, বিন্দু, বীজ, নাদ। এই মহাশক্তিকেই ব্রহ্মযোনি ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতিরূপে যোগীরা সাধনার প্রথম দিকে

মহাকাশে লক্ষ্য করে থাকেন। এই ব্রহ্মযোনি থেকেই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্রহ্মযোনি পার হলে তবেই অনন্ত দিব্য-জগৎ। এই মহামায়ার ছাড়পত্র না পেলে দিব্যজগতে কখনই স্বাধীনভাবে পদচারণা করা সম্ভব নয়। কালীঘাটের মাতৃমূর্তির স্বরূপ তখনই লেখক বুঝতে পারলেন। কেউ জানে না এই মাতৃমূর্তির নাম কি। এই মাতৃমূর্তিই হলেন মাহেশ্বরী মাতৃমূর্তি। সত্যি সত্যিই এই মূর্তির মধ্যে যে কি অপরিসীম শক্তি লুক্কায়িত আছে সাধক ছাড়া অপর কেউ তা জানে না। এই মাতৃমূর্তি যে শুধু একটি বস্তুগত রূপ নয়, লেখক একদিন তার পরিচয় পেলেন কালীঘাটে গিয়ে। লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু আইনজীবী মহীতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রচণ্ড মাতৃভক্ত। রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টি, যাই হোক, তিনি সুস্থ বা অসুস্থ যা-ই থাকুন না কেন নিত্য ৺মায়ের মন্দিরে তাঁর যাওয়া চাইই। প্রায়ই বেশ রাত করে সেখানে তিনি যান। সেদিন লেখকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ভিড় কমে এসেছে, মহীতোষবাবু তাঁর নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে পাণ্ডাদের টাকা দিলেন পুজো দেবার জন্য। তাঁর পর লেখককে বললেন, আপনি পুজো দেবেন না?

লেখক চুপ করে থাকলেন। তিনি যোগ সাধনা করেন বটে, কিন্তু পুজো-আর্চা করেন না। দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁর ঘরে কোন দেবদেবীর মূর্তি নেই। অর্থাৎ একটি সাত্ত্বিক হিন্দু পরিবারে যে-ধরনের দেবদেবী স্থান পেয়ে থাকেন, লেখকের পরিবারে সেরকম কিছু নেই। লেখক পুরোহিত তন্ত্রে বিশ্বাস করেন না এবং সে জন্য তাঁদের মাধ্যমে কোন পুজোও দেন না। লেখককে চুপ করে থাকতে দেখে পাণ্ডা বললেন, কি, পুজো দেবেন তো?

মহীতোষবাবু বললেন, বাবু পুজো-আর্চায় বিশ্বাস করেন না। দেখুন আপনাদের কথাতে যদি রাজি হন? দোকানদার

মহীতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন, উনি কি নাস্তিক?

মহীতোষবাবু বললেন, নাস্তিক কি আস্তিক জানি না। তবে পুজো-আর্চা করেন না। প্রসাদ-টসাদও খান না। সকলেই একটু অবাক হয়ে লেখকের দিকে তাকালেন। মহীতোষবাবু বললেন, কি, দেবেন পুজো?

হঠাৎ লেখকের কি খেয়াল হল, বললেন, দিন। এবং সে জন্য যে কয়টি টাকার দরকার তা পাণ্ডার হাতে দিয়ে দিলেন। পাণ্ডা তাঁর নামগোত্র জেনে নিলেন। এবার মহীতোষবাবু মন্দির চত্বরের যত দেবদেবীর গৃহ আছে সবার ঘরের দেয়ালে মাথা ঠুকে ও চরণামৃত খেয়ে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন মূল ৺মায়ের মন্দিরে। এখানে যে কতক্ষণ তিনি দেয়ালগাত্রে মাথা ঠুকবেন এবং চরণামৃত খাবেন ভেবে শিউরে উঠে লেখক আর তাঁর সঙ্গে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন না। নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে মাতৃদর্শন করার চেষ্টা করলেন। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। ভিড় নেই বললেই হয়। সুতরাং মাতৃমুখ দেখতে মোটেই কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই লেখক যেন রীতিমত চমকে গেলেন। একি দেখছেন তিনি! সেই মহাকাশের সু-উচ্চ প্রান্তরে মাহেশ্বরী মূর্তিতে ৺মায়ের যে রূপ দেখেছিলেন তিনি এ যেন তাই। সেই দিব্যজগতের ৺মাতৃমুখের মতই এ মায়ের মুখের চারপাশ থেকে যেন জ্যোতি বিকিরিত হচ্ছে। সমস্ত পটভূমি থেকে যেন অনন্ত অম্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। লেখক যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। অবাক চোখে সেই জ্যোতির্ময়ী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

জগতে যে বিশ্বাস্য কি, অবিশ্বাস্য কি, কোন মানুষের পক্ষেই তা বোধহয় কোন দিন বিশ্লেষণ করে ধরা সম্ভব নয়। মৃত্তিকা,

দারু বা পাষাণ মূর্তিতে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকতে পারে সাধারণ বুদ্ধিতে তা বোঝা সম্ভব নয়। অথচ এমনও ঘটে। লেখকের নিজের জীবনেই এমন অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে।

কলকাতার কাছেই আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ি। নানা শরিকে বিভক্ত হয়ে গেলেও এখনও তাঁরা থাকেন বেহালার বরিষাতে। আজও তাদের দ্বাদশ শিবমন্দির ও তার আঙ্গিনা রয়ে গেছে, যেখানে বসে একদা তাঁরা জোব চার্নককে কলকাতার ইজারা দিয়েছিলেন। সেই সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের একটি প্রাচীন রথ ছিল। ডায়মণ্ড হারবার রোড সম্প্রসারিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ভাঙাচোরা রথও তাঁরা রথযাত্রার দিন টানতেন। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবার রোড সম্প্রসারিত হবার সময় সেই রথ ভেঙেচুরে যায়। সি. এম. ডি এ-র কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে নতুন করে সেই রথ চালু করা যায় কিনা সেই নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন রায়চৌধুরীদেরই এক শরিক পরিবারের গোরাচাঁদ রায়চৌধুরী। লেখকের কিছু occult faculty আছে শুনে একদিন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যেদিন তিনি লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার আগের রাতে লেখক যখন ধ্যানে বসেছেন, অকস্মাৎ তাঁর ধ্যাননেত্রে ভেসে ওঠে জগন্নাথদেবের মূর্তি। লেখক এতে রীতিমত বিস্ময় বোধ করেন। কারণ, জগন্নাথ সম্পর্কে সচেতন মনে তিনি কখনও চিন্তা করেছেন এরকম মনে করতে পারেন না। তাহলে এ মূর্তি দেখলেন কেন? পরদিন গোরাচাঁদ রায়চৌধুরী তাঁকে এসে জগন্নাথদেব সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি চমকে ওঠেন। তাহলে? তাহলে এই জন্যই কি জগন্নাথ-দেব তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন? এই দেখা দেবার অর্থ কি? জগন্নাথদেব সম্পর্কে গোরাচাঁদবাবু যে প্রশ্ন করবেন, তার

positive answer ? কে যেন লেখককে বলে দিল, হ্যাঁ, তাই। গোরাচাঁদবাবু জানতে চাইলেন, জগন্নাথদেবের রথ নির্মাণের জন্য তিনি যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন, তা অনুমোদিত হবে কি না। লেখক দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। এবং সত্যি সত্যিই অল্প দিনের মধ্যে সি. এম. ডি.এ রথ নির্মাণের জন্য অর্থ অনুমোদন করে পাঠালেন।

এর কিছুদিন পরে লেখক আবার আর একদিন জগন্নাথ মূর্তি দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল গোরাচাঁদবাবু জগন্নাথদেব সম্পর্কে নতুন সমস্যার প্রশ্ন নিয়ে আসবেন। সত্যিই তাই। পরদিন গোরাচাঁদবাবু এসে হাজির ঃ—অর্থ তো পাওয়া গেছে, কিন্তু রথ তৈরির মিস্ত্রি যে পাওয়া যাচ্ছে না! লেখক বলে দিলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন রথ তৈরি হবেই। সত্যিই আশ্চর্য! রথ তৈরির সাতদিন আগে পুরী থেকে ছ'জন মিস্ত্রি এল, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরীর রথের অনুকরণে রথ তৈরি করে দিল।

এর পর আবার একদিন লেখক জগন্নাথদেবকে ধ্যানে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন যে, গোরাচাঁদবাবু নতুন কোন সমস্যায় পড়ে আসছেন। সত্যিই তাই। রথ তো তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে রথ টানাতে বাধা পড়ছে, রথ টানা যাবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জানতেই এসেছেন। লেখক বললেন, 'হ্যাঁ।' সত্যিই রথ টানায় কোন বাধা পড়ল না।

এর পর অনেকদিন পর লেখক আবার একদিন ধ্যাননেত্রে জগন্নাথমূর্তি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে গোরাচাঁদবাবুর কথা মনে পড়ে যায়। তিনি আবার জগন্নাথদেবকে নিয়ে নতুন কোন সমস্যায় পড়েননি তো! কিন্তু কি সমস্যা হতে পারে? রথ তৈরি হয়েছে, টানাও হয়েছে, তবে আবার সমস্যা কি? কিন্তু সমস্যা যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে জগন্নাথদেবকে আবার

তিনি দেখবেন কেন? সত্যিই তাই। বহু দিন পরে আবার গোরাচাঁদবাবু এসে উপস্থিত।

লেখক জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

গোরাচাঁদবাবু বললেন, শেষবারের মত আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

—বলুন।

—রথ তৈরি হয়েছে, রথ চলেছেও। এবার শেষ সমস্যা। রথ রাস্তায় পড়ে আছে। ছেলেরা নোংরা করছে। রথ রাখবার জন্য একটি ঘর তৈরি করবার চেষ্টা করছি। লোকে বাধা দিচ্ছে। আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে তো?

লেখক নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বলে দিলেন, হবে, কারণ তিনি সে সিগন্যাল পূর্বরাতেই পেয়ে গেছেন।

সত্যি সত্যিই তাই। রথের ঘর তৈরি হয়ে গেছে। যে-কোন ব্যক্তি ডায়মণ্ড হারবার যাবার পথে রাস্তার বাঁ দিকে পুকুরের ধারে রায়চৌধুরীদের সেই রথের ঘর দেখতে পাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, জগন্নাথদেবের মূর্তির যদি কোন শক্তিই না থাকে তাহলে এমন একটি ঘটনা ঘটল কি করে? এবং এরকম ঘটনা ঘটবার পর মূর্তির শক্তি ও সত্য সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? কালীঘাটের ৺মায়ের মুখনিঃসৃত জ্যোতিও কি তাই লেখককে বলে দিল যে, দ্যুলোকে তাঁর ৺মাতৃমূর্তি দর্শন অসত্য নয়? এবং সেই মাতৃমূর্তিই কালীঘাটে বাস্তব রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন?

জানি না এ ৺মায়ের মাহাত্ম্য কি। এর পরই লেখকের কাছে নতুন এক জগতের দুয়ার খুলে গেল। কম্পন থেমে গেছে। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথ পরিষ্কার হয়েছে। একটা প্রশান্তবায়ু যেন আসনে বসামাত্র মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে মস্তিষ্কমণ্ডলে প্রবেশ করছে। সঙ্গে মাথাটাকে মনে হচ্ছে একটা ফুটবলের

ব্লাডারের মত হাল্কা। আর কিছুই যেন হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে ফ্লোরেসেন্ট একটা লাইটের নিচে বসে আছেন তিনি। শক্তি ঊর্ধে ওঠার সময় এত দ্রুত উঠে যাচ্ছে যে, দু একটা দৃশ্য এত দ্রুত এসেই গুটিয়ে যাচেছ যে, তা মনে রাখাই কষ্টকর। সিনেমার একটা রিল দ্রুত গুটিয়ে গেলে যেমন হয় তেমন।

এতদিন তৃতীয় নয়নে সূক্ষ্মজগতের নানা দৃশ্য দেখে লেখক অভূতপূর্ব এক আনন্দ বোধ করছিলেন। হঠাৎ সেই দর্শন হারিয়ে যেতে কেমন একটা বেদনা বোধ করতে লাগলেন তিনি। তাহলে বহুদিন যাবৎ যে-সব অতীন্দ্রিয় দৃশ্য তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তাকি নিজের কোন ত্রুটিতে হারিয়ে গেল? শুধুমাত্র একটা জ্যোতির জগতেই বসে থাকছেন তিনি আর তো কোন দর্শন হচেছ না? অথচ একটা প্রশান্ত ভাব অনুভব করছেন।

যখন দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে লেখক ক্রমশ বিমর্ষ বোধ করছিলেন, সেই সময় অকস্মাৎ একটি ঘটনা তাঁকে যেন সত্যিকারের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিল। বেহালায় এসেছেন গুপ্তিপাড়ার নিত্যানন্দ মহারাজ। লেখক হঠাৎই তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য পেলেন। মহারাজ হৃদয় খুলে তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে ছোট্ট একটি পুস্তিকা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। পুস্তিকাটির নাম— 'নিত্য কর্মপদ্ধতি' এতে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে স্তরে স্তরে কি কি অভিজ্ঞতা হয় সাধকের সাধনলব্ধজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

'তারপর বিশ্বজ্যোতি অসীম অনন্ত।
ডুবে যাবে সেথা তুমি হয়ে যাবে শান্ত।
যে-ভাবেতে নড়াচড়া নাহি দোলাদুলি।
উহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে কোলাকুলি।'

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি পড়ার পর লেখকের মন শান্ত হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, ভুল করেন নি। ধ্যানে যতই উচ্চমার্গে

ওঠা যায় ততই দর্শন হারিয়ে গিয়ে জ্যোতির দিকে অগ্রসর হতে হয়। এর কারণ এই ঃ—শূন্যাস্হিত শক্তি যখন ফুটে উঠেছিল তখন প্রথম বিস্ফোরণের ফল স্বরূপ দেখা দিয়েছিল জ্যোতির্গোলক, যাকে আমরা বিন্দু বলি। সৃষ্টির প্রান্তদেশ থেকে তাকে দেখা যায় বলেই এত ছোট মনে হয় যেমন, বহু দূর থেকে দেখা যায় বলেই সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও এত ছোট প্রতীয়মান হয়। কেউ সূর্যের ভেতর ঢুকে গেলে যেমন সূর্যকে আর দেখবেন না, শুধু আলোকময় হয়ে যাবেন। তেমনি বিন্দুতে ঢুকে গেলে শুধু জ্যোতিই দেখা যাবে। এই জ্যোতির ভেতর সৃষ্টির উপাদান এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে, জ্যোতি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন উপায় নেই। লেখক বুঝতে পারলেন যে, তিনি বিন্দুতে প্রবেশ করেছেন বলেই জ্যোতি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। বিন্দু যে—সচ্চিদানন্দের 'আনন্দ' অংশ। 'সৎ' হল শূন্যতা, চিৎ—স্বচ্ছতা (দর্পণতুল্য) 'আনন্দ'

হল বিস্ফোরিত শক্তির জ্যোতি। এরপরই তরঙ্গে তরঙ্গে বিস্ফোরণের আবেগ ঊর্ধ্ব থেকে নেমে এসে নিচের দিকে, সূক্ষ্ম

থেকে স্থূল জগৎ তৈরি করে। ডায়াগ্রাম অংকনে চিত্রটি দাঁড়ায় এই ধরনের ঃ—

বেশ কিছুদিন বিন্দুতে অবস্থান করবার পর লেখক অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। একথা সত্য যে বিন্দুতে প্রবেশ করলে যোগকালে আর কিছুই দর্শন হয় না, কিন্তু পার্থিব অর্থে সচেতন থাকাকালে চোখ বুজলেই, নানা ছবি দেখা যায়। আকাশে মেঘ যেমন বিচিত্র ছবি আঁকে তেমনি দেশে অন্ধকারের বুকে বিন্দুও নানা ধরনের ছবি এঁকে যায়। কেউ কোন প্রশ্ন করলে জ্যোতি ছায়া-ছায়া শূন্যতার বুকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতীক চিহ্ন এঁকে যেন সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়। কখনও কখনও স্পষ্ট ছবি এঁকে প্রশ্নের লক্ষ্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যেন ছবির মত দেখিয়ে দেয়। তা সে যতদূরেই থাক না কেন—ইংল্যান্ড, ওয়াশিংটন, মস্কো। এর পেছনে কোন এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ করে বলে লেখকের ধারণা জন্মায়। সেই ধারণা হল টেলিপ্যাথির ওয়েভলেংথ। এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখা রয়েছে লেখকের 'দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

কিছুদিন দিব্য জ্যোতির্ময় জগতে ঘোরাফেরা করার পর লেখকের মনে হল জ্যোতিও যেন ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, শেষ পর্যন্ত একদিন মনে হল, জ্যোতি নেই। জ্যোতির বদলে অদ্ভুত স্বচ্ছ এক জিনিস যেন লেখকের সামনে অবস্থান করছে। বস্তুত তার কোন বর্ণও নেই। যেন একখন্ড দর্পণ। সেই দর্পণে লেখক নিজেকেই যেন মুখোমুখি দেখতে পেলেন। অদ্ভুত নিজের সমান আকারের নয়। অনেক, অনেক বড় আকারের। লেখক দু-একদিন এ নিয়ে চিন্তা করতেই বুঝতে পারলেন, এছবির অর্থ কি। অর্থাৎ এ ছবি বলতে চায়, তুমি নিজেকে যতটুকু ভাব, তুমি ততটুকু নও, তুমি তার চাইতেও বড়। লেখক চিন্তা করতে থাকেন। এই কি তাহলে আকাশ-দেহ Astral-body ? যোগীরা

যার সম্পর্কে বার বার বলে আসছেন? এই Astral-body বা আকাশ-দেহ যেন Ectoplasm দিয়ে গঠিত। দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। শুধু সূক্ষ্মতর নয় অদ্ভুত রকমে উজ্জ্বল। এই দেহ দেখতে দেখতে ক্রমশ যেন তা সেই দর্পণসদৃশ অনন্ত প্রসারের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগল। সূক্ষ্ম মানসনেত্রে সেই অনন্ত প্রসারিত পটভূমিতে ধীরে ধীরে ভিন্নতর একটা দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল যেন। সূর্য ডুবে গেলে আস্তে আস্তে যেমন ক্রমশ অন্ধকার আকাশে একের পর এক গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্র ইত্যাদি ফুটতে থাকে। তেমনই যেন, অনন্ত এক সৃষ্টির দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল। আস্তে আস্তে ছবি পূর্ণ হল। স্বচ্ছ চৈতন্য সত্তায় সমগ্র বিশ্বজগৎই যেন বিধৃত হয়ে আছে। লেখকের যেন মনে হতে লাগল এই চৈতন্য তাঁর নিজেরই চৈতন্য। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমি তিনি নিজেই। তারই মধ্যে অনন্ত লোক বিধৃত হয়ে আছে। সৃষ্টির মূল বা উৎস তিনি নিজেই। এই প্রথম লেখকের আর একটি বোধ হল। মূলচেতনায় যখনই ফিরে আসতে লাগলেন তখনই দ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত সমস্ত মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁর কাছে অতি সহজেই ধরা পড়তে লাগল। এই ঋষিরা সবাই ছিলেন এক ধরনের মরমিয়া—ইংরেজিতে যাকে বলে Mystic. অন্তরে দর্শন করে বা শ্রবণ করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁরা এসব রচনা করেছিলেন। সেই স্তরে না গেলে তাঁদের সেই ভাষার অর্থ স্পষ্ট বোঝা যাবার নয়। তার বাচ্যার্থ এক ভাবার্থ আর এক। এই যে আন্তর দর্শনে সত্যের প্রতিফলন এ বোধহয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করলে হয় না। সেই জন্যই গ্রীক শব্দ Myen থেকে Mystic শব্দের উৎপত্তি। Myen শব্দের অর্থ রুদ্ধ করা। কি রুদ্ধ করা? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বা Parapsychology যখন সেই জন্য মানুষের আত্মশক্তি নিয়ে চর্চা করছে, তখন বহিরিন্দ্রিয় যত

বেশী সম্ভব কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাইরের স্থূল ইন্দ্রিয়কে কর্মের অযোগ্য করা হলে, এবং মনকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে মানসলোকে ফুটে ওঠা ছবি দেখতে থাকলে অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন হয়। পার্থিব বাধা অতিক্রম করে, যেমন, দেয়াল, মানসতরঙ্গ চর্মচক্ষু না মেলেও ওপারে কারো মনে প্রতিফলিত বা কারো দ্বারা অঙ্কিত বা লক্ষিত চিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পায়। এই জন্য অধিমনোবিজ্ঞানের লেবরেটরিতে নিম্নোক্তভাবে পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তার চোখ, মুখ ও কান বন্ধ করে দিয়ে তাকে মনকে দূরে কোথাও ছুটিয়ে দিয়ে বলা হয় বা দূরে কারো সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়। এবং তার কপালে E. E. G. যন্ত্র বসিয়ে বাইরে তার মানস চিন্তা-তরঙ্গের পরিমাপ করা হয়। এইভাবেই বর্তমান জগৎ আন্তর-শক্তির পরিচয় পাবার চেষ্টা করছে।

মানসনেত্রের সামনে দর্পণসদৃশ জগতের মাঝখানে যে মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি দেখছিলেন লেখক, একদিন ধীরে ধীরে তাও হারিয়ে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে গেলে যেমন অন্ধকার নেমে আসে তেমনই ভাবে অন্ধকার নামতে লাগল। শয়নকালে নিদ্রাজড়িত চোখের পাতা যেমন একসময় কখন ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বাইরে চৈতন্যহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। একদিন এক সময় লেখকও যেন তেমনই কোথায় হারিয়ে গেলেন। যখন ব্যক্তিচৈতন্যে ফিরে এলেন তখন ভাবতেই পারলেন না যে কোথায় ছিলেন। কিন্তু একটি শান্ত ভাব অনুভব করতে লাগলেন, নিবিড় নিদ্রাশেষে যেমন ভোরবেলা উঠে কোন সুস্থদেহী মানুষ শান্ত স্নিগ্ধ ভাব অনুভব করেন তেমনই। এই বোধাতীত অবস্থাকেই বোধ হয় ভারতীয় ঋষিরা পরমাত্মা, ব্রহ্মণ, ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন—যা নির্গুণ ও রূপহীন। এই নির্গুণ ও রূপহীন অবস্থার মধ্যে ডুবে যেতে পারলে তবেই পরম এক

শান্ত অবস্থা অনুভব করা যায়, যে জন্য বাহ্বর ঋষি রাজা বাসকলিকে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'শান্তো ইয়মাত্মা।'

মানুষের ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে

বর্তমান গ্রন্থের শেষে মানুষের ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে অপারিসীম রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে। এ আলোচনার কারণ বহু পাঠক-পাঠিকা আমার 'দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ড পড়ে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, কিভাবে মানুষ নিজের মধ্যে এই অনন্ত অসীম ও রহস্যময় ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারে লেখক তা বলে দেন নি। এতদিন একে গুহ্য বিদ্যা হিসেবে রাখা হত। লেখক হিমালয়ের কোন সাধকের নির্দেশে সেই গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য আদিষ্ট। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের শেষে অন্তর্জগতের দুয়ার খোলার সেই গুহ্য তত্ত্বটি তিনি প্রকাশ করছেন। এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। আধুনিক কালের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পাঠ করলেই সেই গুহ্য তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এবিষয়ে লেখক ঢাকুরিয়া রোটারি ক্লাব আয়োজিত ক্যালকাটা ক্লাবে গত ২৮, ১২, ৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'Man within himself' তার মধ্যেই সেই রহস্যের গোপন কথাগুলি উদ্ঘাটিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে যে সব পাঠক অধ্যাত্ম তত্ত্ব জানার আগ্রহে যোগসাধনায় ব্রতী হতে চান তাঁদের অবগতির জন্য লেখক সেই বক্তৃতাটি যথাযথ অনুবাদ করে দিচ্ছেন।

মাননীয় সভাপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, আপনাদের কাছে যে বক্তব্য আমি রাখতে যাচ্ছি তা বেশ রহস্যময়, সাধারণ ব্যাপার নয়। বিষয়টিকে রহস্যময় বলার চাইতেও মরমিয়া বলেই বেশি আখ্যা

দেওয়া যেতে পারে। বিষয়টি হল 'Man within himself' এ মানুষ যে শুধুমাত্র রক্তমাংসের জীব তাই নয়, বরং আত্মিক। রক্তমাংসের দেহ নিয়ে যে মানুষ সে সীমিত। কিন্তু আত্মিক ক্ষেত্রে সে সীমার অতীত। এইজন্য আমাদের একজন কবি বলেছেন :

'ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর।'

সত্যি সত্যিই মানুষ নিজের অন্তস্তলে আশ্চর্যভাবে রহস্যময়। পরিমাপহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে তার মধ্যে। প্রশ্ন হল, মানুষের মধ্যে এই যে অনন্ত এক বিশ্ব রয়েছে, সেই আন্তর বিশ্বের দুয়ার খোলার উপায় কি ? সেই উপায় হল শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস দেহের মূলাধারে (মূলাধার এবং অন্যান্য চক্র সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) সুপ্ত শক্তিতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে দেহে তাপ সৃষ্টি করে। সেই তাপই দেহকে জীবন্ত রাখে। সাধারণত এই শ্বাসপ্রশ্বাস দেহের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে সেই শক্তির ৪ থেকে ১০ ভাগ শক্তি সঞ্চারিত করতে পারে। কিন্তু সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাস যদি সূক্ষ্ম হয় তবে তার ক্ষমতা (Potency) বেড়ে যায় এবং তা শতকরা একশভাগ শক্তিকে জাগরিত করতে পারে। এবং দেহের মূলাধারস্থ শক্তি পূর্ণমাত্রায় জাগরিত হলে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র দেহের বন্ধনের মধ্যে অসীম রহস্যের সন্ধান পায়।

আমাদের স্থূল দেহ মূলত একটি ক্ষুদ্রবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে প্রণালীতে গঠিত গ্রহের ক্ষুদ্র বিশ্বে অনুরূপ প্রণালীই কাজ করে চলেছে। যে পদ্ধতিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছিল ঠিক অনুরূপ পদ্ধতিই মানুষের দেহের মধ্যে কাজ করে। যে বিশ্বে আমরা বাস করি পদার্থবিদদের মতে সেই বিশ্ব একটি কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে প্রকাশ

পেয়েছিল। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে একে বলে Big Bang. এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ কৃষ্ণ গহ্বর (Black hole) থেকে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তা দেখতে ঠিক সানাইয়ের মুখের মত। দুটি সানাই গোড়ার দিক থেকে পরস্পর যুক্ত করে বসিয়ে দিলে যে চিত্র ফুটে ওঠে চিত্রটি দেখতে ঠিক সেই রকম। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন আইনস্টাইন রোজেনব্রিজ। (এই আইনস্টাইন রোজেন ব্রিজের চিত্র বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দিকেই দেওয়া হয়েছে।) অনন্তের কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) থেকে আলো প্রকাশ পায় হয় শক্তির উপর কৃষ্ণগহ্বরস্থ প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষীয় চাপের ফলে অথবা কৃষ্ণগহ্বরের প্রান্তদেশ থেকে তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ উপেক্ষা করে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসা শক্তি থেকে। কৃষ্ণগহ্বর অথবা তার প্রান্তদেশ থেকে বেরিয়ে আসা শক্তি আলোর আকারে বেরিয়ে আসে স্তরে স্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে (quantum leap)। সত্যি সত্যিই যে এই কৃষ্ণগহ্বর বা তার প্রান্তদেশ থেকে শক্তি আলোর আকারে গোলাকার হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা ১৯৫৬ সালে নিউ জার্সির বেল লেবরেটরিতে শক্তিশালী Micro wave etector-detector-এর সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। যেভাবে কৃষ্ণগহ্বর বা তার প্রান্তদেশ থেকে এই আলোর বিস্ফোরণ হয়েছিল মানুষ তার নিজের মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই বিস্ফোণের পর সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে কিভাবে এই বিশ্বজগৎ ধীরে ধীরে স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তাও দেখতে পারে। দেখতে পারে মনের চোখ দিয়ে।

মানুষের মধ্যে এই যে এক রহস্যময় জগতের খেলা চলেছে মানুষ কি করে তা দেখতে পারে ? কি করে সে বুঝতে পারে যে, সে সীমিত নয়, অসীম ? পথটি খুবই সহজ। বায়ুকে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসকে সূক্ষ্ম করতে পারলেই মানুষ নিজের মধ্যে অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস

স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যদি সে চোখ বুজে তার মনকে ভ্রূমধ্য বরাবর সোজাসুজি দিগন্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। (এ জন্য সাধারণত চৌকির উপর বিছানায় পদ্মাসনে পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে মুখ করে বসতে হয়। পদ্মাসন যাদের সম্ভব নয় তারা সাধারণভাবেও বসে চোখ বুজে মনকে বরাবর দিগন্তের দিকে ঠেলে দিতে পারেন। এজন্য খাটের পেছন দিকে উঁচু রেলিং থাকা দরকার। কারণ এভাবে চোখ বুজে বসলেই দেহের শক্তি মূলাধার থেকে প্রবল বেগে উর্ধ্বে দিকে উঠতে থাকে। ফলে বসে থাকা ব্যক্তিকে উল্টে ফেলে দিতে পারে। যাতে এমন ঘটনা না থাকে সেই জন্য পেছনে একটি হেলান দেবার মত জিনিস থাকা দরকার। যাদের এ ধরনের খাট নেই তারা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পায়ের নিচে একটি কাঠের টুল রেখেও চোখ বুজে দিগন্তের দিকে মনকে ঠেলে দিতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ক্রমেই যেন দেহের কোন অংশ মাটি বা দেয়াল স্পর্শ না করে, কারণ, দেহের ভেতর এই সময় যে শক্তি জাগরিত হয় তা এধরনের কোন conductor পেলে তার মধ্য দিয়ে দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই জন্য চৌকির উপর বা কাঠের চেয়ারে পায়ের নিচে কাঠের টুল রেখে বসার নিয়ম।) চোখ বুজে মনকে সুদূর দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়ে মনকে সেখানে নিবন্ধ করে বসে থাকতে হয়। এতে দু-এক দিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, দিগন্তে অন্ধকার নেই। অন্ধকারের প্রান্তদেশ থেকে আলো ফুটে উঠছে। এই আলোতে মন নিবন্ধ করলেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন কোন রহস্যকাহিনী পড়তে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায় তেমনই। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কমতে থাকে। যতই গতি কমতে থাকে ততই সে সূক্ষ্ম হয়। সূক্ষ্ম হওয়া মানেই তার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া; হোমিওপ্যাথি ওষুধের potency-এর মত।

শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষ্ম হয়ে যতই তার Potency বৃদ্ধি পায় ততই মূলাধারের সুপ্ত শক্তিকে সে বেশি আঘাত করে। এর ফলে সেখান থেকে প্রচণ্ড শক্তি দেহের ঊর্ধ্ব দিকে উঠতে থাকে। প্রথমত এই শক্তি বায়ুর সাহায্যে পেট দিয়ে ওঠে। বায়ুর ঊর্ধ্ব গতির জন্য দেহ দুলতে থাকে। পরে এই বায়ু মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। মেরুদণ্ডের গাঁটে গাঁটে যে মজ্জা রয়েছে সেগুলিকে ধাক্কা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এতে দেহ চমকে চমকে ওঠে।

দেহের মেরুদণ্ডের মধ্যে নানা শক্তি-কেন্দ্র আছে। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে একে চক্র বলা হয়েছে (এ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে)। মূলত ছয়টি চক্র আছে। এর উপরে আছে সপ্তল। এই সপ্তলের উপর আরও দুটি স্তর আছে একেবারে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। প্রত্যেক চক্রের মধ্যে আবার সাতটি স্তর আছে। এইভাবে সপ্তল পর্যন্ত ৭ × ৭ = ৪৯টি স্তর আছে। সর্বোপরি দুটি স্তর নিয়ে ৫১-টি স্তর। এই যে একান্নটি স্তর এই একান্নটি স্তর অনন্তের কেন্দ্র থেকে (**Black hole**) লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমেছিল। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যেতে পারে **quantum leaps.**

বিজ্ঞান **Black hole**-এর যে বর্ণনাই দিক না কেন, ভারতীয় তন্ত্রের ভাষায় এই ব্ল্যাকহোল হল শূন্যতা। এই শূন্যতার অন্তর্স্থিত শক্তিই বিস্ফোরিত হয়ে ধাপে ধাপে চতুর্দিকে গোলাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৫১-তম ধাপে শক্তি অণুর আকৃতি নেয়। অণুর পারস্পরিক সংযোগে বস্তু সৃষ্টি হয়। যেভাবে অনন্তের কোন কেন্দ্র থেকে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে অনুরূপভাবে মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে শক্তি নিচে নেমে এসে মূলাধারে স্থিত হয়েছে। সূক্ষ্ম বায়ুর সাহায্যে মূলাধারস্থ শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে জাগরিত করে কেউ যদি তা ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে ওঠাবার চেষ্টা করে

তাহলে সৃষ্টি কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কালে সূক্ষ্ম ও স্থূল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যে যে অবস্থা ও দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল প্রান্তভাগ থেকে তাকে কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা হলে মানুষ নিজের দেহবিশেষে সেই সেই স্তর ও দৃশ্য থেকে থাকে।

শক্তি মূলাধার থেকে উর্ধ্বে ওঠার কালে কি কি দৃশ্য ও রঙ সাধারণত একজন সাধকের নজরে পড়ে? শক্তি উত্তোলন কালে বর্তমান লেখক এ ক্ষেত্রে যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

(১) যখন শক্তি মূলাধার চক্র ভেদ করে চলল সাধক লালরঙ দেখতে পান। যখন মূলাধার চক্রের উপর স্বাধিষ্ঠান চক্র ভেদ করে সাধক তখন সবুজ রঙ দেখতে পান। যখন মণিপুর চক্র ভেদ করে তখন মানসনেত্রে গ্রীষ্মের দগ্ধ আকাশের মত সাদা রঙ চোখে পড়ে। যখন বক্ষ অঞ্চলে অনাহত চক্র ভেদ করে তখন বায়ুমণ্ডলের নীল রঙ চোখে পড়ে। বিশুদ্ধ চক্র ভেদ হলে নীল রঙ বা ব্যোম চোখে পড়ে। আজ্ঞা চক্র ভেদ হলে রঙের বিস্ফোরণ চোখে পড়ে। সপ্ততলে এই রঙগুলির সূক্ষ্ম লীলা হয়, এর পর Florescent আলোর মত আলো চোখে পড়ে, যাকে অধ্যাত্ম ভাষায় বলে জ্যোতি। যখন শক্তি প্রায় ব্রহ্মরন্ধ্রের নিকট ওঠে তখন দর্পণের মত স্বচ্ছ এক দেশ নজরে পড়ে। শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করলে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কোন বোধই থাকে না। মানুষের দেহের মধ্যে রঙের এই আশ্চর্য খেলার জন্য অনেকে মানুষকে রঙের বাক্স (Colour Box) বলে বর্ণনা করেছেন।

(২) শক্তির এই উর্ধ্ব গতির সময় সাধক যে শুধুমাত্র নানা রঙ দেখেন তাই নয়, আরো অনেক জিনিস তিনি দেখতে পান। প্রথমত দেখতে পান কৃষ্ণগহ্বর বা Black hole থেকে নির্গত

আলো। Blackhole তত্ত্ববিদ্‌রা যাই ভাবুন না কেন, যোগীরা জানেন যে, বিশ্ব-কেন্দ্রে অনবরত বিস্ফোরণ হচ্ছে। এই কেন্দ্রকে বৈজ্ঞানিকেরা Grand Unified Field বলেছেন। চুপ করে উপরোক্ত নির্দেশমত বসে থাকলে সাধক শক্তির wavelength-এর জন্য তার মানসচক্ষে গোলাকৃতি আলো দেখতে পান যাকে 'আইনস্টাইন-রোজেনব্রিজ' বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে নিজের কাছ থেকে যতই কেউ দিগন্তের দিকে সরে যায়, ততই বিশ্বের উৎসের কাছাকাছি আসে। তখন অদ্ভুতভাবে দেখা যায় যে, নিজেরই প্রতিবিম্ব নিজের মানসনেত্রের সামনে ভেসে উঠছে। প্রথম দিকে পেছন দিক করে, পরে কাত হয়ে, শেষে মুখোমুখি।

এর পর নিজের আকৃতির বহু মানুষ দেখা যায়, অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি বহু জীব দেখা যায়। এই দর্শন পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই হয়। পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কোন ছারপোকাকে—hypersphere-এ কোন টেলিস্কোপ দিয়ে বসিয়ে দিলে সে যদি সেই টেলিস্কোপ দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকায়, তা হলে সে নিজেকেই পেছন দিক থেকে দেখবে। টেলিস্কোপের angle যদি একটু ওঠানো যায় তাহলে সে নিজেকে মুখোমুখি দেখবে। এরপর দেখবে নিজের আকৃতির বহু প্রাণী। টেলি-স্কোপের angle আরও একটু ওঠালে যে গোলাকৃতি আলো দেখবে। পদার্থবিজ্ঞানের মতে যদি কোন ত্রিমাত্রার (Three dimensional) জীব দুই মাত্রার (Two dimensional) জীবকে স্পর্শ করে তাহলে দ্বিমাত্রার জীব ত্রিমাত্রার জীবকে গোলাকার দেখবে। সুতরাং সাধক যখন শক্তির উত্তোলনকালে গোলাকৃতি কোন আলো দেখেন তা কোন বহুমাত্রিক জীবের হতে পারে। এরাই হয়তো অতিমানবীয় জীব। যদি সাধক নিজেই সেই মাত্রার (Dimension) স্তরে পেঁছান তাহলে সেই গোলাকৃতি আলোর যথার্থ জীব তাঁর চোখে ধরা পড়বে। এই

জীবকেই হয়তো দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ শক্তি উত্তোলন কালে পাহাড়, পর্বত, নদনদী, সাগর, ভিন্ন গ্রহ, ভিন্ন গ্রহের জীব সবই দেখতে পারে। শুধু সাধক যখন অনন্ত জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করেন তখন আর কিছুই দেখতে পান না। তখন তাঁর মধ্যে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় শক্তি দেখা দেয়। তখন জাগ্রত অবস্থায় চোখ বুজলেও এই জ্যোতি নানা রূপরেখা অঙ্কন করে, বা অক্ষরে লিখে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে। এই মানুষই অলৌকিক শক্তির সাধক হিসাবে পরিগণিত হন।

যোগে শক্তির ঊর্ধ্বগতির সময় স্থূল দেহ সত্তার সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটে। একে বলা হয় তন্দ্রা। একজন সিদ্ধ সাধক স্বামী মুক্তানন্দ এক্ষেত্রে তাঁর নিজের যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন তাই বর্ণনা করছি। এই তন্দ্রার সময় সাধকের নানা দর্শন হয় যেমন, পাহাড়পর্বত, নদনদী, দেবদেবী, সাধুসন্ত এবং আরো অনেক কিছু (kundalini, The secret of life, Swami Muktananda. P. 36.)। সাধক-মানুষের নিজের অন্তস্তলে এই যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিকেরা আজও তার সন্ধান পাননি। অঙ্কের হিসেবে এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান দ্বারা একে জানাও যাবে না। যদি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হয়, তবে অধ্যাত্ম জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিকে ধ্যানে বসতে হবে। এই জন্য আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট স্টীফেন ডক্টর হকিং-এর অন্যতম এক বন্ধু ব্রায়ান জোসেফসন (Brian Josephson) সত্য সন্ধানে অর্থাৎ বিশ্বরহস্য উন্মোচনে ধ্যান করতে আরম্ভ করেছেন।

মানুষের অন্তর্জগতের এই অসীমত্ব মহাবিশ্বের অসীমত্বের মতই বিশাল। একে যদি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় তাহলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। বর্তমান বক্তা সমবেত জ্ঞানী-গুণী-জনের ধৈর্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চান না। সুতরাং এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

———